বাংলাপিডিএফ

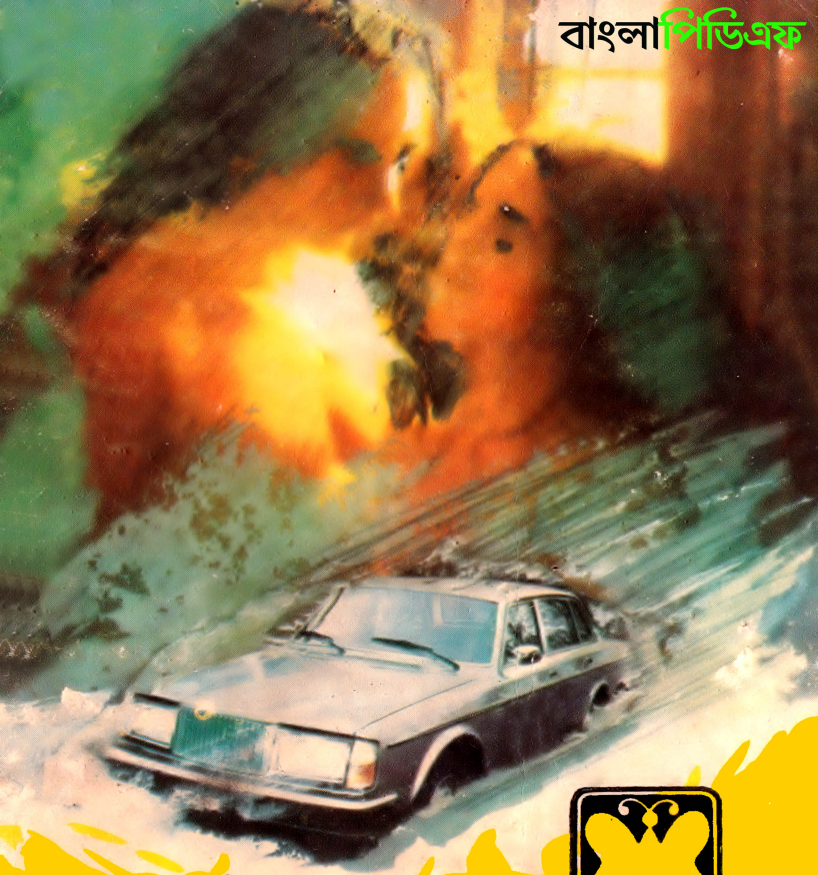

সবা প্রকাশনা

কলঙ্কিনী

সাগর চৌধুরী

রনি

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি রহস্য উপন্যাস

আর্তনাদ । কাজী আনোয়ার হোসেন
বিশ্বাসঘাতক । কাজী আনোয়ার হোসেন
বন্দিনী । কাজী আনোয়ার হোসেন
পাপে মৃত্যু । কাজী আনোয়ার হোসেন
মরণ নেশা । কাজী আনোয়ার হোসেন
ব্ল্যাকমেইল । হীরক চৌধুরী
হ্যাণ্ডস আপ । কাজী আনোয়ার হোসেন
কামিনী কাঞ্চন । সুধাময় কর
রহস্যময়ী । কাজী আনোয়ার হোসেন
বিদেশ যাত্রা । রকিব হাসান
হত্যা রহস্য । কাজী আনোয়ার হোসেন
দড়াবাজ স্পাই । শেখ আবদুল হাকিম
দাঁড়াও পথিক । কাজী আনোয়ার হোসেন
ড্রাগস । রকিব হাসান
অবসর বিনোদন । রকিব হাসান
হলো না, রত্না ! । কাজী আনোয়ার হোসেন
দক্ষিণ সাগর । রকিব হাসান
বিষ । কাজী আনোয়ার হোসেন
ছায়া শিকারী । বিশু চৌধুরী

এবং মারিও পুজোর
গড ফাদার
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম

কলঙ্কিনী

একখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সাগর চৌধুরী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

সেবা প্রকাশনী কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৬৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

KALANKINI
By Sagar Chowdhury

এক

নেহাল বানুর পরনে পাতলা দুধ-সাদা সিল্কের শাড়ী। কনুই পর্যন্ত ঢাকা সাদা জামা। শ্যাম্পু করা লালচে চুলের রাশ আলগা হয়ে ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে।

বসেছিল পা ছড়িয়ে ডিভানের উপর। পায়ের কাছে আহ্লাদী মুখ নিয়ে বসে আছে হাল্কা-পাতলা রোগা একটি যুবক। নেহাল বানু তার কথা শুনে খিল খিল করে হাসছিল।

ওরা দু'জন অনেকক্ষণ টের পায়নি যে আমি ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

বৈশাখের গরম বাতাসে ঘরের ভারি পর্দা উড়ছে। সকাল সাড়ে দশটা। চারদিকে উজ্জ্বল রোদ। সৈয়দ জামালের মোজেক করা দোতালা বাড়ির উপর আকাশ নির্মেঘ ও সুনীল।

আমি চুপ করে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠছে মন। এই মুহূর্তে সৈয়দ জামাল আর তার যুবতী স্ত্রী নেহাল বানুকে যতটা ঘৃণা করছি তারচেয়েও বেশি করুণা করছি নিজেকে। আমি যা

ছিলাম আর যা হয়েছি ভাবতে গিয়ে তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধে বারবার বিষিয়ে উঠছি।

অবশেষে নেহাল বানু আমাকে দেখতে পেল। চমকে উঠলো সে। বিস্মিত হলো। ডিভানে ছড়িয়ে থাকা পা জোড়া গুটিয়ে সোজা হয়ে বসলো। কৌতূহলী হয়ে উঠলো তার চোখ দু'টি।

সেই হালকা-পাতলা রোগা যুবকটি পায়ের কাছে বসে আহ্লাদের গলায় বললো: তুমি তো কিছুতেই বিশ্বেস করছো না ভাবী যে তোমাকে আমি ভালবাসি। বেশ, আমার কবিতাগুলো তোমাকে পড়ে শোনাই। তাহলে তুমি বুঝবে। তোমাকে আমি কত ভালবাসি। পড়বো? —টেনে টেনে সে আব্দারে গলায় অনুমতি চাইলো।

ভালবাসা!

নেহাল বানুর ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে উঠলো একটা তির্যক হাসি। বুক থেকে সরে গিয়েছিল সিল্কের আঁচল। খাটো ব্লাউজের নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সরু কোমর। ভ্রূক্ষেপমাত্র করলো না নেহাল বানু। আঁচলটা বুকে টেনে নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো। পর্দা পার হয়ে বাইরে এল। আমাকে স্থির চোখ তুলে অবিচল দেখতে লাগলো।

সেই রোগা যুবকটিও এসময় বাইরে এসে আমাকে দেখলো। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালো। বানুর কাছে সরে গিয়ে বললো: মার্কেটিং করতে যাবে বলেছিলে ভাবী, গাড়ি তৈরি আছে, চলো।

বানু বললো : আমাকে এখন বিরক্ত করো না জসিম। তুমি তোমার কাজে যাও।

: বিরক্ত করবো না!

অবাক হয়ে বিড়বিড় করলো জসিম। ঘরের দিকে যেতে যেতে আপনমনে বললো :

: বিরক্ত করবো না। বেশ···

জসিম চলে যাবার পর আমরা দু'জন কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রইলাম। নেহাল বানুর সুন্দর লালচে মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠলো। মৃদু গলায় বললো : আপনি ?

বললাম : সৈয়দ জামালের সাথে দেখা করতে এসেছি।

: কেন ?

: সেটা তাকেই বলবো।

: আমাকেও বলতে পারেন, আমি সৈয়দ জামালের স্ত্রী। তাছাড়া, সৈয়দ জামাল আপনার কথা নাও শুনতে পারে।

মনে হলো হয়তো নেহাল বানু ঠিক কথাই বলছে। সৈয়দ জামাল, দাম্ভিক, খুনী সৈয়দ জামাল, আমার কথা নাও শুনতে পারে। কিন্তু যুক্তির কথা অর্থহীন মনে হলো। রাগে উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম : কিন্তু শুনতে তাকে হবেই। আমি তাকে শেষ সুযোগ দিতে এসেছি।

আমার চিৎকারে একটুও বিব্রত হলো না নেহাল বানু।

আঁচলটা আবার পড়ে গিয়েছিল, সেটা কাঁধে তুলে দিয়ে মৃদু হাসলো। বললো: নাকি? আপনার কথা সৈয়দ জামালকে শুনতেই হবে! কিন্তু মনে আছে তো, বিচারে আপনার পাঁচমাস জেল আর দশহাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে নেহাল বানু। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম। বললাম: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। পাঁচমাস জেল খেটে এই তো সবে ফিরেছি। এত সহজে কি সব কথা ভোলা যায়! আমি কিছুই ভুলিনি। সৈয়দ জামাল পাছে ভুলে যায় এজন্যেই ছুটে এসেছি তাকে ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দিতে।

নেহাল বানুর আয়ত চোখে এই প্রথম ভয় মেশানো বিস্ময় দেখলাম।

বললাম: সৈয়দ জামাল কোথায় আছে বলুন। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

নেহাল বানু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বললো: সৈয়দ জামাল অফিসে আছে। অফিসে যান দেখা হবে।

: কদ্দুর এখান থেকে অফিস?

: সদর রাস্তা ধরে সোজা তিন মাইল যাবেন। নদীর ঠিক পাড়েই ওর অফিস বাড়ি আর কারখানা।

খবরটা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম সৈয়দ জামালের রূপসী স্ত্রী নেহাল বানুকে। হঠাৎ আইরিনের মুখটা মনে পড়ে গেল এসময়, আর রক্তে বিষিয়ে উঠতে লাগলো উত্তপ্ত সেই ঘৃণা,

সেই রাগ।

আমি চলে আসছিলাম। নেহাল বানু আমাকে ডেকে ফেরালো। ওর লিপস্টিক মাখা লাল ঠোঁটে এখন আর অবজ্ঞা নেই। পরিহাস ও কঠোরতা নেই। নেহাল বানু অনেকটা সহজ-স্বাভাবিক।

আমার আরও খানিকটা কাছে এসে দাঁড়ালো নেহাল বানু। ওর গা থেকে মিহি ঘাম আর সেন্টের গন্ধ পাচ্ছিলাম। মেয়েটার শরীরের বাঁধুনি এমন শক্ত আর শরীরময় এত লাবণ্য ও কোমলতা যে সুস্থ-সবল যে-কোনো পুরুষের রক্তই ওকে দেখে উপভোগের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠবে।

নেহাল বানু গভীর একটা নিঃশ্বাস চাপলো। আস্তে আস্তে বললো ঃ আপনি কি ইচ্ছে করেই দুঃখ পেতে চান ?

ঃ আমি দুঃখ ভুলতে চাই।

ঃ তাহলে আপনার উচিত সৈয়দনগর ছেড়ে এক্ষুণি চলে যাওয়া। সৈয়দ জামাল যে কি ভয়ঙ্কর লোক তা আপনি এখনও বুঝতে পারেননি।

নেহাল বানুর কথা ঠিক আমার কানে গেল না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ওর দেহ-সৌন্দর্য দেখছিলাম। লাবণ্য-মাখা চমৎকার লালচে মুখ। লম্বা ঘাড়। উন্নত স্তন যুগল। সরু কোমর আর পুষ্ট নিতম্ব।

সৈয়দ জামালকে হত্যা করতে পারলে এই অতুলনীয় দেহ-

সৌন্দর্যের আধিকারিণী নেহাল বানুই বিধবা হবে, বিষণ্ণ হবে, ভাবতে চমৎকার লাগছিল আমার।

: বুঝলেন, মাহমুদ সাহেব, আর না এগিয়ে চুপচাপ এ জায়গা থেকে সরে পড়ুন।

আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম : আমার নামটাও দেখছি ভোলেননি।

নেহাল বানু ঠোঁট কামড়ে ধরে বললো : তাহলে আপনি সৈয়দনগর থেকে চলে যাচ্ছেন ?

: না। আমি অফিসে যাচ্ছি।

: দেখা করবেন সৈয়দের সাথে ?

: হ্যাঁ।

: ওকে শাসাবেন ?

: ওকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

: তাহলে আর কি, যান।

নেহাল বানুর ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। বললো : আমি কিন্তু আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম। সাহস থাকা খুবই ভাল। কিন্তু অতি সাহস অনেক সময়···

: অনেক সময় ?

: মৃত্যু ডেকে আনে। সৈয়দ জামালের বাড়ির ভেতরে ঢুকে কাজটা আপনি ভাল করেননি।

দুই

ধুলো উড়ছিল রাস্তায়।

নদীর কোল ঘেঁষে রাস্তাটা চলে গেছে, মহকুমা শহরে। শহর থেকে সৈয়দনগরের দূরত্ব দশ মাইল। মাথার উপর বেলা এগারোটার তীব্র রোদ। থেকে থেকে গরম বাতাসের ঝাপ্টা।

পথের দু'পাশে বড় বড় গাছ। ডানদিকে নদী আর বাঁদিকে ছোট ছোট টিলা। টিলাগুলো কাঁটা জাতীয় গুল্ম-লতায় ঢাকা।

হাঁটছিলাম সামনের দিকে আর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম।

আমার যা কিছু ছিল সব লুট করে নিয়েছে সৈয়দ জামাল। আমি সৈয়দ জামালের কোনোই ক্ষতি করিনি। অথচ আমার সবচে' বড় ক্ষতি হলো তারই হাতে।

আমার পাঁচ মাসের জেল হয়েছিল। রায় দেবার সময় মাননীয় বিচারক বলেছিলেন: রাস্তায় যারা বেসামাল হয়ে গাড়ি চালায় আইনে তাদের অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। আসামীকে আমি অর্থদণ্ড দিয়েই ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আসামীর

মধ্যে আমি এমন অস্থিরতা, নিষ্ঠুরতা, আইন-অমান্যতা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার প্রমাণ পেয়েছি যে তাকে আইনের নির্দয়তম শাস্তি দেয়াই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

অস্থিরতা, নিষ্ঠুরতা, আইন-অমান্যতা, দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা!

কথাগুলো আমি মনে মনে আওড়ালাম। হাতের মুঠি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। নির্দয়তম শাস্তি! তা-ই বটে! বিনাদোষে হতভাগ্য মাহমুদ পেল নির্দয়তম শাস্তি, আর খুনী সৈয়দ জামাল পেল সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস! এরই নাম বিচার? এরই নাম আইন?

উঁচু হয়ে রাস্তাটা উঠেছে একটা লোহার ব্রিজে। তুমুল হর্ণের শব্দ তুলে ঢাল বেয়ে বিপরীত দিক থেকে আসছে একটা লরী। লরী দেখে বিক্ষত মনটা নতুন করে আর একবার চম্‌কাল। রাস্তা ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়ালাম ব্রিজের। নাহ্, এসব চিন্তা করে লাভ কি?

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম। রাস্তা আবার নির্জন। ব্রিজের নিচে নদীর পানি চিকচিক করছে। নদীর চরায় বসে আছে এক ঝাঁক রাজহাঁস। বহু দূরে, প্রায় দিগন্তের কাছাকাছি একটা পাল তোলা নৌকোর ছোট্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে সচকিত হলাম। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম আরও। দেরি আর সহ্য হচ্ছে না। সৈয়দ জামালের মুখোমুখি হবার জন্যে বিষাক্ত মনটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ জামালের রক্ত পান করার জন্যে পাঁচ মাসের জেল খাটা দাগী মনটা উন্মাদ হয়ে আছে।

আমি জানি এছাড়া আমার করার আর কিছুই নেই। এমনভাবে ক্ষতি করা হয়েছে আমার যে আইনের বিপক্ষে গিয়ে তীক্ষ্ণতম একটা ছুরি সৈয়দ জামালের বুকে বসিয়ে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

রক্তে দারুণ জিঘাংসার আগুন জ্বলছে।

সৈয়দ জামালকে আমি আজ হোক কাল হোক নিষ্ঠুরতম উপায়ে হত্যা করবো। সহজে নয়। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারবো তাকে। জেল থেকে বেরোবার পর এছাড়া আর কি করবো আমি? আইরিন নেই যে তাকে নিয়ে নীড় বাঁধবো। চাকরি নেই যে সুশৃঙ্খলভাবে জীবনকে গড়বো আবার। এখন আমার একমাত্র কাজ প্রতিশোধ নেয়া, একমাত্র চিন্তা সৈয়দ জামাল, একমাত্র সুখ হত্যার আনন্দ উপভোগ করা।

তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। অন্যমনস্ক চিন্তা করছিলাম। একমাত্র আল্লা জানেন কি যন্ত্রণা ভোগ করছি প্রতি মুহূর্তে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই।

আবার হর্ণের শব্দ। পিছন ফিরলাম।

লাল রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন আসছে সৈয়দনগরের দিকে। ভেতরে কেউ নেই। ড্রাইভিং সিটে গগলস পরা মধ্যবয়স্ক

এক ভদ্রলোক। গাড়িটা সামনের ডাইভারসনের ক্লিয়ারেন্স না পেয়ে একটু দূরে গিয়ে থেমে পড়লো।

ড্রাইভিং সিটের ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম।

বোরহান আহমেদ!

অজান্তেই একটা গালি বেরিয়ে এল গলা চিরে: কুত্তার বাচ্চা!

কিন্তু বোরহান আহমেদ বোধহয় আমাকে দেখতে পায়নি। আমি মাত্র এগিয়ে গিয়ে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছি আর অমনি ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

আমি এগোলাম।

আশ্চর্য, বোরহান আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই বাদাম গাছগুলোর পাশেই, যেখানকার মাটি শুঁকলে এখনও হয়তো আইরিনের তাজা রক্তের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।

এটা কি নেহাতই আকস্মিক ঘটনা?

অথবা পরবর্তী কোনো ঘটনার অশুভ সংকেত?

আমি কি সৈয়দ জামালের অর্থ-বল লোকবল আর হীন ষড়-যন্ত্রের কাছে আবার পরাস্ত হবো? ভেসে যাবো খড়-কুটোর মতো?

সেদিন রাতেও এই লাল রঙের ফোক্সওয়াগেনে করে ঘটনা-স্থলে এসেছিল বোরহান আহমেদ। ৩০০ মডেলের মার্সিডিস বেঞ্জের পিছু পিছু। এই বোরহান আহমেদের সাক্ষ্যেই বিচারক

তার রায়ের সিদ্ধান্ত তৈরি করেছিলেন।

বোরহান আহমেদ! কুত্তার বাচ্চা!

আমি তীব্র ঘৃণায় অশ্লীল বকতে লাগলাম। সৈয়দ জামালের টাকায়ই মুখ খুলেছিল সে। নতুবা চরম ক্ষতিগ্রস্ত, নিরীহ মাহমুদের বিরুদ্ধে বিরূপ সাক্ষ্য দিত না থানার বড় দারোগা বোরহান আহমেদ। একেবারে এক নম্বরের সাক্ষী, যে কিনা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল আর সব ঘটনা চাক্ষুষ দেখেছিল।

বিচারক কিভাবে একজন দায়িত্বসম্পন্ন ও. সি-র সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন?

বাদাম গাছগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

বাতাস বইছে উদ্দাম। খোলা আকাশের নিচে নদী।

নদীর পানিতে ঝিকিমিকি।

একটা পাখি উড়ে গেল আকাশে। আইরিন, আইরিন, তোমার খুনের প্রতিশোধ আমি নেবোই।

তিন

সারা রাস্তা কেউ আমাকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু সৈয়দ জামালের বিরাট অফিসের গেটে ঢোকার পরই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দারোগা বোরহান আহমেদ। রাগে জ্বলছে যেন তার চোখ দু'টি।

আরও কয়েকজন লোক জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। বুঝলাম গাড়ি দিয়ে আসতে আসতে দারোগা বোরহান আহমেদ আমাকে ঠিকই দেখেছিল। আরও বুঝলাম আমারই অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত ঐ লোকটা ঘৃণা করে। কেন করে আমি জানি না। আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে ওরা, আমার সর্বস্ব লুট করেছে। ষড়যন্ত্র করে মিথ্যে মামলায় জেলে পাঠিয়েছে আমাকে। এত করেও শান্তি হয়নি বোরহান আহমেদের।

কিন্তু আমি তো এখন সবকিছুর বাইরে। অতীতের প্রেতাত্মা আমি। আমার আর কি ক্ষতি করতে চায় বোরহান আহমেদ।

যার কিছু নেই তার কি হারাবার ভয় থাকে ?

গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। জটলা পাকানো লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে যেন কি পরামর্শ করছে। ওরাও আমাকে চেনে। সৈয়দ জামালের সব কর্মচারীই আমাকে চেনে। না চেনার কথা নয়। দীর্ঘ একবছর মামলা চলেছিল মহকুমা শহরের কোর্টে। ফলে এই অঞ্চলের অত্যন্ত পরিচিত লোক হয়ে গেছি আমি। আমার দুর্ভাগ্যই এজন্যে দায়ী।

আমি কাউকে না দেখার ভান করলাম। কিন্তু বোরহান আহমেদকে এড়ানো গেল না। সে দু'পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। হিংস্র হয়ে উঠলো চোখজোড়া। আমি বললাম : রাস্তা আটকেছেন কেন ?

: জিজ্ঞেস করছি কোথায় যাবে তুমি।

: তুমি নয়, আপনি। ভদ্রভাবে কথা বলুন। কোথায় যাবো জিজ্ঞেস করছেন ? সৈয়দ জামালের কাছে যাবো। শুনলেন ?

: হুঁ তেজ এখনও কিছুমাত্র কমেনি।

বোরহান আহমেদ আস্তে আস্তে বললো। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবলো। তারপর বললো : বেশ, ভদ্রতা বজায় রেখেই বলছি, আপনি সৈয়দনগরে কেন এসেছেন ?

: ব্যক্তিগত কাজে।

: তা তো বটেই। কিন্তু মনে আছে কি আপনি একজন জেল-

খাটা দাগী লোক আর আমি হচ্ছি এ এলাকার একজন পুলিশ অফিসার।

ঃ বেশ তো, আপনি যা ইচ্ছে হয় করুন।

বোরহান আহমেদ গম্ভীর হয়ে উঠলো। শক্ত গলায় বললো ঃ পুলিশকে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই, মিঃ মাহমুদ। আমি শুধু এইটুকু বলার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি যে আপনি সৈয়দনগর থেকে মানে মানে চলে যান।

একই কথা বলেছিল নেহাল বানু। হয়তো সৈয়দ জামালও তাই বলবে। আবার আমার বুকের ভেতর জেগে উঠলো খুনের পিপাসা। ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ি মিথ্যুক লোকটার উপর, পরে কি হবে সে ভয় তো করিই না।

অনেক কষ্টে নিজেকে চেপে রাখলাম। আমি হত্যা করতে এসেছি সৈয়দ জামালকে। তীব্রতম যন্ত্রণা দিয়ে তাকে নিজের হাতে খুন করবো,—খোদার কসম। বোরহান আহমেদকে তত-ক্ষণ সহ্য করতেই হবে।

বললাম ঃ আপনার কথা শুনলাম মিঃ বোরহান। এখন পথ ছাড়ুন।

ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে তক্ষুণি আমাকে গ্রেফতার করবে বোরহান আহমেদ। কিন্তু গ্রেফতার করা দূরে থাক, বোরহান আহমেদ আমার কথা শুনে কেমন এক ধরনের অসহ্য মিষ্টি মোলায়েম হাসলো। বললো ঃ আপনার ভালোর জন্যেই

বলেছিলাম। ঠিক আছে নিজের বোকামি আর ধৃষ্টতার ফল শীঘ্রই আপনাকে ভোগ করতে হবে। যান।

বোরহান আহমেদ বাঁ দিক ধরে হাঁটতে শুরু করলো। অতি চমৎকার চেহারা লোকটার। ফর্সা, ছিপছিপে, লম্বা। চুলগুলো ব্যাক ব্রাশ করা। লম্বা পুরুষ্ট জুল্‌ফি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে সম্ভবতঃ। কিন্তু আশ্চর্য শক্ত আছে শরীরের বাঁধুনি। দেখে মনে হয় যেন কোনো সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক।

ঢত্বর পার হয়ে অফিসের প্রশস্ত বারান্দায় উঠলাম। কয়েক সারি ঘরের মাঝখানে লম্বা প্যাসেজ। বারান্দায় উঠতেই দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা। ওরা দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। আমাকে দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রায় আধ ডজন লোক তখনও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম সবারই দৃষ্টি অনুসরণ করছে আমাকে।

ওদের চোখে ঘৃণা আর ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নেই আমি জানি। সৈয়দ জামালের অন্ধ-ভক্ত এরা। সৈয়দ জামালের শত্রু এদেরও শত্রু। সৈয়দ জামাল যাদু করেছে এদের। না, সৈয়দ জামাল নয়, সৈয়দ জামালের টাকা আর ক্ষমতা যাদু করেছে এদের। আমার টাকা নেই, ক্ষমতা নেই, তাই আমি হেরে গেছি সৈয়দ জামালের কাছে। কিন্তু এবারে আমি হারবো না। সব বাঁধন ছেড়ে, সব মোহ কাটিয়ে সব খুইয়ে আমি এসেছি আজ সৈয়দনগরে। আমার হেরে যাবার ভয় নেই, কিছু

তাদাদাত আশঙ্কা নেই। আমি দুর্বার।

আমাকে রুখতে পারে এমন শক্তি কারও নেই এখন। লম্বা প্যাসেজের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল একজন তক্‌মা-আঁটা পিয়ন। তাকে সৈয়দ জামালের ঘর কোন্‌টা জিজ্ঞেস করায় সে ভয়ে আর বিস্ময়ে দোতালার সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম।

বাঁয়ে একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্ট। ডানে সবশুদ্ধ পাঁচটা ঘর। শেষের ঘরটায় ভারি পর্দা ঝুলছে। তামার ফলকে লেখা আছে রুখসানা কবির পি. এস।

পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। যুবতী প্রাইভেট সেক্রেটারীটি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। সৈয়দ জামালের সাথে দেখা করতে চাই বলায় সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কিছু বললো না। নিঃশব্দে একটা কার্ড এগিয়ে দিল। আমি কার্ডে আমার নাম ও উদ্দেশ্যের কথা লিখলাম। রুখসানা কবির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

একটু পর ফিরে এসে বললোঃ আসুন।

চার

প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা, সেই অনুযায়ী চওড়া, বিরাট দৈত্যের মতো দেখতে সৈয়দ জামাল। ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে হবে বয়স, দেখে পঁয়তাল্লিশের বেশি মনে হয় না। শরীরে তেমন বাড়তি মেদ নেই, কার্যক্ষম শক্ত-সমর্থ চেহারা। পরনে দামী গ্রে-কালার স্যুট, গ্রে-কালার হোয়াইট টিপ্‌ড্‌ টাই। চওড়া কপালের নিচে ভোঁতা এক জোড়া চোখ ও মোটা নাক। ঠোঁট দু'টি কালো ও পুরুষ্টু। বাঁ'গালে একটা লম্বা কাটা দাগ।

আমি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। আমার বুকের গভীরে তাণ্ডব নৃত্য করছিল সেই প্রচণ্ড ক্রোধ। সৈয়দ জামালও তাকালো আমার দিকে, কিন্তু বুঝলাম আমাকে দেখে একটুও বিস্মিত হয়নি সে।

দামী রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে সৈয়দ জামাল। বললো: তোমাকে কেমন যেন কাহিল মনে হচ্ছে মাহমুদ। কী ব্যাপার? জেল খেটে কবে বেরোলে? রিয়্যালি মাহমুদ, ঐ অ্যাক্সিডেন্টটার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। যাই

বলো ভাই, দোষটা কিন্তু তোমারই ছিল। আরে, বস্‌ছো না কেন, বসো,—বসো। আরাম করে বসো, কি খাবে বলো, ঠাণ্ডা কিছু ? কি হলো, তুমি কি এখনও সেই বিশ্রী ব্যাপারটা ভুলতে পারছো না ?

ঃ কি করে ভুলবো ? ভাল করেই আপনি জানেন এটা ভোলা যায় না, ভোলা সম্ভব নয়।

ঃ কিন্তু না ভুলেই বা কি লাভ বলো ? অ্যাক্সিডেণ্ট ইজ অ্যাক্সিডেণ্ট, তাই না ? দেখো মাহমুদ, তুমি বিশ্বেস করবে কিনা জানি না। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি তোমার জেল হওয়ায় আমি দুঃখ পেয়েছিলাম।

ঃ বটে ?

আমি হেসে বললাম ঃ দুঃখ পেয়েছিলেন ? কিন্তু মামলাটা স্যার আপনিই লাগিয়েছিলেন। অথচ দেখুন, নর-হত্যার অভিযোগ এনে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা উচিত ছিল আমারই। কারণ দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ছিলেন আপনি। আর ক্ষতিটা হয়েছিল একতরফা,—আমারই। আপনার গাড়ির চাকার তলায় পড়ে প্রাণ হারালো আইরিন আমার স্ত্রী। আর উল্টো ক্ষতিপূরণ দিলাম আমি, জেল খাটলাম।

ঃ বসো তুমি মাহমুদ।

সৈয়দ জামাল গাঢ় গলায় বললো ঃ ওসব কথা আর তুলো না, প্লিজ।

: আমি দুঃখিত জামাল সাহেব। আপনার কাছে যা একটা সামান্য ব্যাপার আমার কাছে তা-ই চরম ক্ষতি।

: মাহমুদ, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো তুমি, প্লিজ! আমার মতো তোমার যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতো, শয়ে শয়ে লোক খাটাতে হতো ব্যবসায়ে, যদি হাজার কাজের ভিড়ের ভেতর থেকে মেজাজ বিগড়ে যেত, তাহলে তোমার দোষ দিতাম না আমি। দোষ দিতাম তোমার অবস্থার, তোমার পরিবেশের!

আমি আবার হাসলাম। বললাম: চমৎকার ভাল মানুষ হবার চেষ্টা করছেন জামাল সাহেব? বলতে চাচ্ছেন সে রাতে যখন গাড়ি চালাচ্ছিলেন তখন হাজার কাজের ভিড়ে থেকে মেজাজ বিগড়ানো ছিল আপনার, আর ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা? ভাল জামাল সাহেব, একেই বলে চমৎকার আত্ম-সাফাই। কিন্তু যা-ই বলুন আপনার কোনো কথায়ই ভুলছি না। আমি বলতে এসেছি যে আপনি আমার স্ত্রী আইরিনকে খুন করেছেন, আপনি খুনী···

সৈয়দ জামালের ভোঁতা চোখ দু'টি চকচক করে উঠলো। হেলান দিয়ে বসেছিল, এবার সোজা হয়ে বসলো। একটা হাত টেবিলে লম্বাভাবে ছড়ানো আর একটা হাত কোলের উপর।

আমি বললাম: অতি চমৎকার আপনার বিনয়, আপনার ভদ্রতা, আপনার উদারতা। একটা মানুষের জীবন দলে-পিষে চুরমার করে দিয়ে আপনি হয়তো এখন কায়দা করে বলবেন

আপনি দুঃখিত। হয়তো বলবেন আপনি অনুতপ্ত···

ঃ মাহমুদ···

গম্ভীর ও কঠোর শোনায় সৈয়দ জামালের কণ্ঠস্বর ঃ তুমি ভুল করছো! ভদ্রতা আমি সকলকেই দেখিয়ে থাকি, শত্রুকেও। কারণ আমি বিশ্বাস করি ওতে লাভ বই ক্ষতি হয় না। কিন্তু তুমি যা ভেবেছো তা ঠিক নয়। অনুতপ্ত আমি নই। কারণ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিলে তুমিই। বিচারে তা-ই তোমারই শাস্তি হয়েছিল। আমি বলবো উচিত সাজাই তোমাকে দিয়েছেন মাননীয় বিচারক। তোমার চেহারার দুর্দশা দেখে দুঃখ হয়েছিল বলে একজন ভদ্রলোকের মতো সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে। আর কিছু না···

ঃ যাক এতক্ষণে তাহলে স্বভাবের ছদ্মবেশ খুলে আসল রূপটা দেখাতে শুরু করেছেন!

আমি তিক্ত গলায় বললাম ঃ আমি আপনাকে ভাল করেই চিনি। শেষবারের মতো দেখতে এসেছিলাম আমার স্ত্রীকে হত্যা করে আপনি অনুতপ্ত কিনা।

সৈয়দ জামাল আমার কঠোর আর বেপরোয়া ভাব-ভঙ্গি দেখে বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আমি কিছুমাত্র পরোয়া না করে বললাম ঃ আমি আপনাকে শেষ সুযোগ দিতে এসেছিলাম জামাল সাহেব।

ঃ আমাকে হুমকি দেবার চেষ্টা করো না মাহমুদ। আবার

বলছি আমি তোমার ভাল চাই। এই দেখো, এতক্ষণ হয় তুমি এসেছো অথচ বসলে না পর্যন্ত, পাগলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকে যাচ্ছো···ছিঃ মাহমুদ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়··· অনেক বড়···আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা উচিত না তোমার···

আমি ঠাট্টা করে বললাম : হ্যাঁ, আপনাকে আমার পিতাজী বলে ডাকা উচিত। পায়ের তলায় বসে গুন্‌গুন্ কথা বলা উচিত! কিন্তু জামাল সাহেব আমিও আপনাকে বলছি ওসব ন্যাকামি আপনি ভুলে যান। আইরিনের খুনের প্রতিফলের জন্যে আপনি তৈরি থাকবেন।

: তৈরি থাকবো? মানে? তুমি কি করবে ভেবেছো?

: যা করা উচিত তাই। অমন চোখ বড় বড় করে তাকাবেন না স্যার। খুনের বদলে কি শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন আপনি?

: খুন?

প্রশ্ন করলো সৈয়দ জামাল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

আমি হাত সরিয়ে নিলাম টেবিল থেকে। বললাম : সৈয়দ-নগরে আমি বেশ কিছুকাল থাকবো জামাল সাহেব। খোদা চাহেত আবার দেখা হবে···

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পর্দা তুলেই থমকে গেলাম।

পর্দার বাইরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে বোরহান আহমেদ। বোধহয় সব কথাই সে শুনেছে।

আমাকে দেখে মৃদু হাসলো সে। বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেল না।

পাঁচ

নিচে নেমেই দেখলাম চারদিক যেন থম্‌থম্‌ করছে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। বেলা একটার কম হবে না।

দুই সারি দোতালা দালানের মাঝখানে খোলা প্রাঙ্গণ। এখানে-ওখানে জট্‌লা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু লোক। সবাই স্তব্ধ। সবাই অপলক নেত্রে আমাকে তাকিয়ে দেখছে।

আমি প্রাঙ্গণে নামতেই সামনের লোকগুলো সচকিত হয়ে উঠলো। দু'পাশের লোকগুলো নিঃশব্দে গুটি গুটি এগিয়ে আসতে লাগলো।

পেছন থেকে কে যেন 'শুয়োরের বাচ্চা' বললো। কেউ বিদ্রূপ করে হাসলো। মোটা গলায় কেউ একজন ফিসফিস করে বললো : না, না··· এখানে নয়···

একটা রহস্যময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো তারপর। আমি এগিয়ে চলেছি গেটের দিকে। বুঝতে পারছি পেছনের লোকগুলোও আমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। চারজন লোক গেটের বাঁ পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি গেটের কাছে যেতেই

ওরা গেটের বাইরে চলে গেল।

কি ঘটতে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছিলাম। এরা সবাই সৈয়দ জামালের লোক, বোরহান আহমেদের লোক। এরা বুঝতে পেরেছে আমি সৈয়দ জামালকে শাসাতে এসেছিলাম। চোখে-মুখে এদের অসহ্য ক্রোধ আর অপরিসীম ঘৃণা। এরা আমাকে আজ ছেড়ে দেবে না।

গেটের বাইরে এসে একবার পেছন ফিরলাম আর অজান্তেই চমকে উঠলাম। একেবারে ঘাড়ের কাছেই এসে পড়েছে পেছনের লোকগুলো। ওদের হাতগুলো শক্ত মুঠি করা আর চোখে রাগের আগুন।

সামনে পেছনে বহু লোক। আমি বাঁ'দিকে চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর এগোতেই কতগুলো মস্ত ঝাঁকালো শিরীষগাছ। গাছের ছায়ার নিচে একটা ঝাঁপ বন্ধ দোকান। চারদিকে খানিকটা কাঠের স্তূপ। বুঝলাম এটা লাকড়ির দোকান।

আমি সদর রাস্তায় পড়ার শর্ট-কাট পথ খুঁজছিলাম। ঝাঁপ-বন্ধ দোকানটার কাছে এসেই বুঝলাম মারাত্মক ভুল করে বসেছি। সদর রাস্তা এখান থেকে ঠিক উল্টোদিকে পড়ে। এটা সৈয়দ-নগরের প্রাইভেট ট্রেন-লাইনের শেষ মাথা। ট্রেনলাইনের দু'পাশে ঘন জঙ্গল আর পাথুরে টিলা। জায়গাটা যেমন নির্জন তেমনি ভয়ঙ্কর।

আর চিন্তা করার সময় ছিল না। সামনের চারজন লোক

প্রথম এগিয়ে এল। তারপর পেছনের লোকগুলো।

প্রত্যেকের হাতেই একটা করে শক্ত লাকড়ি। আমাকে কেন্দ্র করে হিংস্র শ্বাপদের মতো চারদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো ওরা। ওরা সংখ্যায় অনেক। হয়তো পঞ্চাশ-ষাটজন।

ওরা এখন কথা বলছে না। এগিয়ে আসছে। চারদিকে প্রকাণ্ড শিরীষগাছের ছায়া। জঙ্গল। ট্রেন-লাইন। অদ্ভুত নির্জনতা বিরাজ করছে সর্বত্র।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু আর ভাবতে পারছিলাম না সৈয়দ জামালের মুখটা ছাড়া। চারদিকে তাকালাম, সূর্যের আলো বহুদূরে রক্তপাতের মতো লুটিয়ে আছে।

ঠিক এসময় পেছনে কোমরের মাঝামাঝি জায়গায় একটা তীব্র লাকড়ির বাড়ি এসে লাগলো। আমি এজন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ। প্রথম আঘাতটা লাগতেই বুঝলাম ওদের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

কোমরে বাড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। কে একজন চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দাঁড় করালো। তারপর ছোট একটা লাকড়ি দিয়ে আমার গাল ঘষে দিল যেন আদর করছে এরকম ভঙ্গিতে।

লোকগুলো হেসে উঠলো প্রকাণ্ড বিদ্রূপে। সামনের একটা লম্বা মতো বলিষ্ঠ লোক জোঁকের মতো চিমটি দিয়ে ধরলো আমার থুতনীর নিচের নরম মাংস আর চেঁচিয়ে বললো ঃ কেমন লাগছে

চাঁদ ? কেমন লাগছে ?

ধস্তাধস্তি করে নিজেকে আমি ছাড়িয়ে নিলাম আর হামা-গুড়ি দিয়ে সরে এলাম ওদের চক্র থেকে। ওরা হৈ হৈ করে উঠলো। চোখের পলক পড়তে না পড়তে আমার চারপাশে আবার ওরা ঘের দিয়ে দাঁড়ালো···

ঃ কি স্যার, শখ মিটলো ?

বেঁটে মতো একটা চওড়া কাঁধওয়ালা ধাড়ী লোক এগিয়ে এসে আমার সামনাসামনি দাঁড়ালো এবং হাতের লাকড়িটা জবাই করার মতো ঘষে ঘষে চালাতে লাগলো অনাবৃত গলার চামড়ায়।

ঃ কোরবানি দিয়ে ফেলো শালাকে।

ঃ পেট ফেড়ে দাও হারামির।

ঃ কেমন লাগছে চাঁদ, অ্যাঁ ? ব্যথা লাগছে, হ্যাঁ ? লাগছে ? ওরে স্যারের পোঁদে গুনে গুনে দশটা লাথ্ বসিয়ে দে-তো···

আমি এই প্রথমবারের মতো ফিরে তাকালাম। এলোপাতাড়ি পড়ছে লাকড়ির বাড়ি শরীরের নানান জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড মুখ, ভাসছিল আমার চোখের সামনে। সৈয়দ জামালের মুখ। প্রত্যেকটা মুখে দেখলাম সেই ঘৃণিত মুখ, সেই হত্যাকারীর অবয়ব।

ওরা ক'জন লোক আমি ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর আমি, আমি দুর্বল। অন্ধ হয়ে গেলাম।

বোধশক্তি লোপ পেল আমার। ঝাঁপিয়ে পড়লাম তীব্র আক্রোশে সামনের লোকটার উপর। হিংস্র জন্তুর মতো কামড়ে ধরলাম ওর টুঁটি। লোকটা মরণ চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

সেই লম্বা লোকটা এবার সামনে। সে আমার পাশ কাটাতে চাইছিল। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। চিৎ করে ফেলে দিলাম ওকে। খুঁজতে লাগলাম ওর চোখ। লোকটা আমার উদ্দেশ্য বুঝলো। প্রাণপণ শক্তিতে সে বুকের ওপর থেকে ঠেলে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। চিৎকার করতে লাগলো পাগলের মতো। ওর সব শক্তি ফুরিয়ে আসছিল আমার বজ্র-পেষণে। ঠিক এস-ময় ঘাড়ে, পিঠে, গলায় প্রচণ্ড লাকড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো। জানতাম শেষ পর্যন্ত আমি ফুরিয়ে যাবো ওদের আক্রমণের সামনে এবং অবশেষে তাই হতে যাচ্ছে। আমাকে ওরা টেনেহিঁচড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কেউ একজন পায়ের বুট দিয়ে প্রকাণ্ড লাথি চালালো মুখে। আমি একটা দুর্বল হাত দিয়ে ধরতে চাইলাম সৈয়দ জামালের সব ক'টা প্রতিকৃতি। অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো চারদিকে। নিষ্ঠুরভাবে লোকগুলো মারছে আমাকে। পাগলের মতো মারছে। মারছে।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমি সৈয়দ জামাল-কে খুঁজছিলাম।

ছয়

অসহ্য একটা ব্যথা নিয়ে চোখ মেলে তাকালাম। কোথায় আছি বুঝতে পারলাম না। চারদিকে অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। উপরে অবারিত আকাশ। সেখানে লক্ষ লক্ষ তারা মিট মিট জ্বলছে। বাতাসে বনেলা ঘাসের গন্ধ। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক।

পাশ ফিরে শুতেও দারুন কষ্ট হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো শরীরের সব জোড়া আলগা হয়ে গেছে, সব ক'টা হাড় চূর্ণ হয়ে গেছে। সারা গায়ে থল্‌থল্ করছে আহত মাংস। চোখ-দু'টো পুড়ে যাচ্ছিলো তীব্র চিন্‌চিনে ব্যথার বিষে।

জ্ঞান হবার পর আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়লো। হিসেব করে দেখলাম আমি এগারো থেকে বারো ঘণ্টার মতো সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো মৃত মনে করে ওরা আমাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু জায়গাটা কোথায় চিনতে পারলাম না। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি, জীবন-তৃষ্ণা তখন প্রবল। চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা চিনতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। সহসা একটু দূরের একটা পাথর-

ফলকের উপর চোখ পড়তেই বুকের অবশিষ্ট চেতনা অবশ হয়ে আসতে লাগলো। আমি গোরস্তানে শুয়ে আছি।

ওরা আমাকে নিরাপদ স্থানেই ফেলে রেখে গেছে। মৃত্যুর রাজ্যেই আমার স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্যাচ প্যাচে কাদার মতো কাপড়ে ও শরীরের যত্রতত্র রক্তের চিহ্ন। ভেতরের দু'টো দাঁত ভেঙে গেছে। গলার চামড়া পোড়া ঘায়ের মতো ভীষণ জ্বলছে। কোমরে ও পেটের দু'পাশের পাঁজরে অসহ্য ব্যথা। আমি কি করে উঠে দাঁড়ালাম, রাস্তায় গেলাম একটা খালি ট্রাকের পেছনে উঠে শুয়ে রইলাম ও শেষ রাতে মহকুমা শহরে এলাম সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

মন বললো তুমি বেঁচে আছো। কারণ সৈয়দ জামাল এখনও মরেনি। মন বললো পৃথিবীতে আশ্চর্যজনক ঘটনাও বহু ঘটে, আইরিনের মৃত্যু কি কম আশ্চর্যজনক ঘটনা? তোমাকে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে হবে এবং এজন্যেই বিধাতা এই অসম্ভব ঘটনাটা ঘটালেন।

হোটেল পর্যন্ত এসেও আমার জ্ঞান ছিল। হোটেলে এসে আবার জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম আমি হাসপাতালের একটা বেডে শুয়ে আছি।

সপ্তাহ খানেক পর আমি মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ফিরে এলাম হোটেলে।

হোটেলের ম্যানেজার এই ঘটনার পর অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলো আমাকে। ম্যানেজারের সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি আমার সমস্ত সংযম যেন ভাসিয়ে দিতে চাইলো। হোটেলের যেখানেই আমি অবস্থান করি না কেন, ম্যানেজারের ঘোলা দু'টি চোখ আমাকে খুঁজে ফিরতে লাগলো।

বেশ ক'দিন আমি চুপচাপ হোটেলে রইলাম নিজের ঘরে। ডাক্তার আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। শরীর ছিল দুর্বল, মন ক্লান্ত। কিন্তু তাহলেও মুহূর্তের জন্যেও আমি আমার পরিকল্পনার কথা ভুলতে পারছিলাম না। যে হোটেলে রয়েছি সেটা মহকুমা শহরের এক প্রান্তে। সৈয়দনগর উপ-শহর থেকে আমার হোটেলের দূরত্ব দশ মাইলের বেশি নয়। আমি অপেক্ষা করছিলাম সেই একটা দিনের জন্যে যেদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমি সৈয়দনগর চলে যাবো এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করবো।

আমি জানি আমার চিন্তা-ভাবনা, প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব যুক্তির বাইরে। কিন্তু যুক্তির ধার ধারে কে? আমি জনৈক মাহমুদের সুখ-স্বপ্নময় অতীত জীবনের এক প্রেতাত্মা মাত্র। সৈয়দ জামালকে যদি সাধারণভাবে খুন করার ইচ্ছে আমার থাকতো তাহলে যে কোনো সময়ই আমি তা করতে পারতাম। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সৈয়দ জামালকে হত্যা করতে চাই না। আমি যেমন তীব্রতম যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে ফুরিয়ে গেছি, সৈয়দ জামালকেও

সেই পথেই, তীব্রতম যন্ত্রণা দিয়েই শেষ করতে চাই।

সুতরাং কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

আমি বেশ সুস্থিরভাবেই অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক।

কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষই ইতিমধ্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আমাকে কেউ সহ্য করতে পারছে না।

এমনকি হোটেলের ম্যানেজারটা পর্যন্ত আমার গতিবিধি ও অবস্থানের উপর নজর রেখেছে।

আমার সংযমের বাঁধ মাঝে মাঝে ছিন্ন হয়ে যেতে চায়।

সৈয়দ জামালের আমি শত্রু কোনো সন্দেহ নেই। সৈয়দ জামালের জন্যে আমি হিংস্র পশু, মানুষরূপী শয়তান।

কিন্তু এই-ই কি আমার সব পরিচয় ?

আর সব মানুষের কাছে আমি কি অন্যায় করেছি যে ওরা আমার বিরুদ্ধে লেগেছে দল বেঁধে ?

সন্ধ্যাবেলা আমি নিজের ঘরে বসেছিলাম।

দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে অল্প অল্প হাওয়া আসছিল। হোটেলের কোনো এক ঘরে রেডিওতে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বাজছে। সন্ধ্যার বরাদ্দ চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো হোটেলের ম্যানেজার মিঃ আয়েন উদ্দিন।

ছোটখাটো লোকটা। হালকা, ছিপছিপে।

চোখ দু'টি ধূর্ত আর শাণিত।

দ্রুত কথা বলে। কথা বলার সময় চোখ দু'টি স্থির, অচঞ্চল হয়ে যায়।

ঘরে ঢুকেই লোকটা ধূর্ত দু'টি চোখ দিয়ে ঘরের চারদিকে একবার দেখে নিল। তারপর কাছে এসে কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললো : আমরা খুব দুঃখিত মিঃ মাহমুদ যে···

আয়েন উদ্দিন কি বলবে আমি জানতাম। তার জন্যে প্রস্তুতও হয়ে গেছি ততক্ষণে। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। হেসে বললাম : আগে বসুন মিঃ আয়েন উদ্দিন···আমার ঘরে এসেছেন, অন্ততঃ বসুন, একটু আরাম করে। তারপর দুঃখের কথা শোনা যাবে···

আয়েন উদ্দিন কেমন একটু হকচকিয়ে গেল। এভাবে কথার উপর বাধা পড়বে সে ভাবেনি। মুহূর্তে আরও গম্ভীর হয়ে গেল চোখ-মুখ। বললো : আরাম বরং আপনিই করুন মিঃ মাহমুদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রাতটার বেশি এই হোটেলে আপনাকে থাকতে দিতে পারছি না···

: বলেন কি ? আমি তো আরও দু'মাস এখানে থাকবো বলে ভাবছিলাম। তা হঠাৎ এই থাকতে দিতে না পারার কারণ ?

: সেটা আপনিও জানেন স্যার !

আয়েন উদ্দিন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্থির গলায় বললো : জলে বাস করে আর যাহোক কুমীরের সাথে ঝগড়া করতে পারি না। কি স্যার বুঝতে পারছেন না এখনও ? তাহলে বলি শুনুন,

এই বাড়িটার মালিক হচ্ছেন সৈয়দ জামাল সাহেব, আমরা তাঁর ভাড়াটে মাত্র।

ঃ তাই নাকি ? সৈয়দ জামালের কথায়ই তাহলে আমাকে তাড়াচ্ছেন আপনারা ?

রেগে উঠলো আয়েন উদ্দিন। বললো ঃ না, সৈয়দ সাহেব কিছুই বলেননি। সব ব্যাপার জেনে আমিই আপনাকে উঠে যেতে বলছি।

একটু থেমে রাগত গলায় আয়েন উদ্দিন বললো ঃ সৈয়দ জামালকে আপনি এখনও চেনেন না স্যার। সৈয়দ জামাল সাহেবের মতো পরোপকারী আর ভদ্র মনের মানুষ দুই দশ তল্লাটে একজনও নেই।

ঃ বটে ? ভদ্র ও পরোপকারী ? ভাল ভাল। তা আমাকে তাড়াচ্ছেন কেন ? সৈয়দ জামালের সাথে আমার শত্রুতা আছে তা-ই ?

আয়েন উদ্দিন একটু হাসলো ঃ কিছু মনে করবেন না স্যার, কথাটা মোটামুটি তা-ই দাঁড়াচ্ছে বটে। কিন্তু ওটা হলো ভেতরের কথা। আইনের প্রশ্ন যদি তোলেন তো বলবো হোটেলে রিপেয়ারিং ওয়ার্ক চলবে শীঘ্রই, ধরুন আগামীকাল থেকেই, সুতরাং···

আয়েন উদ্দিন আরও কিছুক্ষণ আইন সম্পর্কে লেকচার ঝাড়লো। অত্যন্ত তুখোর লোক। খাঁটি হোটেল ব্যবসায়ী। অর্থাৎ আইন আর বে-আইন, সামনের দরজা আর পেছনের

দরজা তুই-ই ভাল করে চেনে।

এর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

আয়েন উদ্দিন, দেখেই বোঝা যায় ভয়ঙ্কর পাকা লোক। যা বলবে তা সে করবেই।

ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ?

তারচে' অন্যত্র সরে যাওয়া ভাল।

মুখে হাসি টেনে বললাম ঃ রাত্রি বেলাই যে রিপেয়ারিং ওয়ার্ক শুরু করেননি, তারজন্যে বহুত শুকরিয়া আয়েন উদ্দিন সাহেব। ঠিক আছে কালই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ও. কে?

ঃ ও. কে স্যার।

আয়েন উদ্দিন আবার ভদ্রতা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে হাসলো। তারপর চলে গেল।

স্যুটকেসের কাপড়ের ভাঁজ থেকে বোতলটা বের করলাম। সময় অসহ্য হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীটা ভরে উঠেছে ঘৃণা আর প্রতিহিংসায়। চারদিকের আশ্রয়ের ঘাঁটিগুলো একে একে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলাম।

মদ আমি নতুন খেতে শিখেছি। আইরিনের মৃত্যুর পর। নতুন শিখেছি, কিন্তু ভয়ঙ্কর নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এরই মধ্যে। পুলিশ ইন্সপেক্টর বোরহান হলফ করে বলেছিল মাননীয় বিচা-

রককে : হুজুর আসামীকে মাতাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল গাড়িতে।

অথচ মদ আমি ইতিপূর্বে স্পর্শও করিনি।

এখন মদ আমার সঙ্গী। প্রিয় বন্ধু। মদ খেয়ে অসহ্য সময়-টাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভুলতে পারি।

শরীর জ্বলে উঠলো। চিন্তাগুলো পুড়তে লাগলো।

মনে পড়লো সেই রাত, স্বপ্নের মতো, দুঃস্বপ্নের মতো সেই রাতটা।

উদ্দাম হাওয়া ছিল সেই রাতে। বৈশাখের উচ্ছ্বসিত হাওয়া। সঙ্গিনী ছিল আইরিন, আমার ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রী। গাড়ি ছুটে যাচ্ছিলো নির্জন গ্রাম-পথ ধরে সমুদ্রোপকূলের দিকে। পাশে বসে আইরিন কথা বলছিল, হাসছিল।

হাওয়ায় উড়ছিল আইরিনের রেশমী চুল। মাঝে মাঝে ওর শাড়ির সুরভিত আঁচল আমার চোখে-মুখে এসে লাগছিল।

ওকে বলেছি : শাড়ির আঁচল সামলাও আইরিন। তোমার শাড়ির আঁচল অন্ধ করে দিচ্ছে আমাকে। গাড়ি চালাতে পারছি না।

আইরিন হেসে বলেছে : নিজেকেই সামলাতে পারছি না তো শাড়ির আঁচল।

: বটে, সামলাতে পারছো না ? কি রকম লাগছে তাহলে ?

ঃ ছিপি আটা সোডার বোতল, স্যার, কিছুতেই বাগ মানছে না।

ঃ রোসো, রোসো। মাইল দশেক গেলেই কাজলপুর ডাক-বাংলো। সোডার বোতল ওখানেই খুলবো, খোদার কসম।

আইরিন আমার গায়ে চিমটি কাটে। বলে ঃ অসভ্য! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

রাতটা এমন হাওয়ায় উড়ানো, সুরেলা অন্ধকারের মিষ্টি আমেজে ভরা ছিল!

মাঝারি স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি।

পথের দু'পাশে বড় বড় কড়ুই আর বাদামগাছ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজে ছাওয়া টিলা চোখে পড়ে এপাশে-ওপাশে। নির্জন রাস্তা। ক্বচিৎ একটা আধটা গাড়ির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

প্রায় ষাট মাইল রাস্তা অতিক্রম করেছি আমরা।

সামনে রয়েছে আরও বহু মাইল পথ।

আমরা হানিমুন কাটাতে যাচ্ছি সমুদ্রের ধারে। এতক্ষণ আমরা এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি আনন্দে আর উল্লাসেই।

বিয়ে হয়েছিল জুম্মার নামাজের আগে আর সন্ধ্যার পর পরই আমরা দু'জন গাড়িতে চেপে বসেছিলাম।

বন্ধু-বান্ধব শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

আইরিনের ভাবী বলেছেন ঃ রিনী, এই লোকটাকে কখনও

ছাড়িস না। ও হলো অকূল সাগরে তোর চির-কেনা মাঝি···

সাদিক ঠাট্টা করে বলেছিল : মাহমুদ, ঐ গানটা মনে আছে রে··· মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না ? ওরকম যেন করিসনি ভাই !

বলেছি : কি করবো, না করবো তাহলে তোরাই বলে দে।

সবাই হেসে উঠেছিল। আইরিনও।

সকলের শুভেচ্ছা কুড়িয়ে আমরা গাড়িতে চেপে বসেছিলাম। সামনে সমুদ্রোপকূলের হানিমুন কটেজে পৌঁছার পথ, পাশে আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আইরিন।

পরনে লালচেলী।

স্বপ্নের মতো সুন্দর। জীবনের মতো ঘনিষ্ঠ।

গাড়ি ছুটে চলেছিল আর স্বপ্নের মতোই লাগছিল সবকিছু। হাত বাড়ালেই যাকে পাওয়া যায়, অথচ যাকে এখনও স্পর্শ মাত্র করিনি, সেই আইরিন আমার পাশে বসে আছে।

হাসছে। কথা বলছে।

বলছিল : গাড়ি একটু থামাও না ভাই। চলো ঐ ছোট্ট নদীটার ধারে কিছুক্ষণ বসি।

বলেছি : তা বসতে পারি। কিন্তু ধরো কোনো অবটন যদি ঘটে যায় ?

: ঘটুক না।

: বটে, খুব সাহস দেখছি। এই জায়গাটার নাম জানো ?

ঃ কি ?

ঃ পাথর-ঘাটা। পাথর-ঘাটার ডাকাতের কথা শোনোনি ?

হাসতে হাসতে আইরিন বলেছিল ঃ পাথর-ঘাটার ডাকাতের ভয় আমার নেই মশায়। ভয় হলো যার পাশে বসে আছি সেই ডাকাতের।

ক্রমে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। দু'পাশে রুক্ষ পাহাড় ও বড় বড় গাছপালা।

নির্জন পথে গাড়ি কখনও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কখনও বিশাল মাঠের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভবিষ্যতের মধুর কল্পনায় কখন যে বিভোর হয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

আইরিন বলেছিল ঃ আমি কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি কক্সেস-বাজার থাকবো না। বলেছি ঃ কেন, ছুটি তো বেশ অনেকদিনের পাওয়া গেছে। পুরো ছুটিটাই কক্সেসবাজার কাটিয়ে যাই না কেন।

ঃ না।

আইরিন বলেছে ঃ আগে ঘর-দোর ঠিক করবো, সংসার সাজাবো। আমাকে কিন্তু একটা রেডিওগ্রাম কিনে দিতে হবে ঢাকায় ফিরেই।

গানের দিকে অদ্ভুত দুর্বলতা আছে আইরিনের। নিজে সে ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু গান শোনার দিকে দারুণ আগ্রহ।

শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখার্জি, মেহদী হাসান, সিনাত্রা, রবসন, লতা মুঙ্গেশকর আর মিশরের উম্মে কুলসুমের বহু রেকর্ড সংগ্রহে আছে ওর।

ওর কাছে জীবনটা গানের মতোই কোমল, সুন্দর। আইরিন বলে সঙ্গীতের বাণী আর সুর হৃদয়ঙ্গম করার পরই মানুষ পরিপূর্ণ হয়।

আমি ঠাট্টা করে হেসেছি। বলেছি : কিন্তু আমি যে একজন কাঠখোট্টা একাউনটেন্ট রিনী।

রিনী বলেছে : তাতে কি! আমি অঙ্ক আর সঙ্গীত এক সাথে মিলিয়ে দেবো।

: চমৎকার। আমি যখন অফিসে তখন অঙ্ক আমার ধ্যান। যখন আমি বাড়িতে তখন সঙ্গীত আমার প্রাণ।

: তা কেন মশায়। যখন আপনি অফিসে তখন সঙ্গীতও যাবে আপনার পিছু পিছু। যখন আপনি বাড়ি আসবেন তখন অঙ্কের হিসেবও নিয়ে আসবেন সাথে করে।

: একেই বোধহয় বলে ডান হাতে মধুভাণ্ড বাম হাতে বিষের পাত্র?

আইরিন হাসিমুখে বলেছে : এরই নাম জীবন! সুখ ও দুঃখ জীবনের দুই নাম। বেদনা ও আনন্দ জীবনের দুই মুখ। জীবনকে আমরা সুখে-দুঃখে, বেদনায়-আনন্দে পান করবো।

হেসে বলেছি : আপাততঃ গলা শুকিয়ে কাঠ বেগম সাহেবা।

গাড়ি থামাই রাস্তার পাশে। আপনি ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে এক পেয়ালা চা তুলে দিন আমার হাতে।

রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। চা খেলাম। দশটার কাছাকাছি হয়ে এসেছে রাত। আর ক'-মাইল গেলেই কাজলপুর ডাকবাংলো।

দু'জনেরই ইচ্ছে কাজলপুর ডাকবাংলোর নিভৃত কক্ষেই হবে প্রথম বাসর।

দুগ্ধফেননিভ সজ্জা না-ই থাকলো। ফুলের মালা না-ই পরলাম। আইরিনের রেশমী চুলের ঘ্রাণে রাত্রি সুরভিত করবো। শরীর হবে সজ্জা আর দু'টি কোমল স্বর্ণ-লতার মতো হাত পূরণ করবে মালার অভাব।

প্রথম বাসর সজ্জার কথা ভাবতে গিয়ে দু'জনই কিছুক্ষণ চুপ করে উদ্বেলিত মধুর-বেদনা অনুভব করলাম। রক্তে ভালবাসার বাঁশি বাজছে। বুকে পাগল হয়ে উঠেছে নাম না-জানা এক অথৈ সমুদ্র। গাড়ি ছুটে চলেছে আবার। দু'জনই অপেক্ষা করছি কাজলপুর কখন পৌঁছবো এই আশায়।

আইরিন বললো ঃ এই, এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছো কেন? হেসে বললাম ঃ খুব ব্যস্ত, তাই।

ঃ না, না···স্পীড কমাও লক্ষ্মীটি। আমার ভয় করছে··· চল্লিশ থেকে একেবারে ত্রিশে কমিয়ে দিতে হলো স্পীড। চমৎকার হাওয়া বইছে চারদিকে। ছুটে পালাচ্ছে অন্ধকারময়

গাছপালা। বহুদূরে মায়ের শান্ত চোখের মতো গ্রামের প্রান্তে জ্বলছে দু'টি একটি প্রদীপ।

সামনে পড়লো উঁচু হয়ে ওঠা সৈয়দনগরের ব্রিজ। হাই-ওয়ে। ব্রিজ পার হলাম নিরাপদেই এবং তারপরই ঘটলো সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

এতক্ষণ স্বপ্নের মায়াজাল বুনে পথ এগোচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু কে জানতো স্বপ্নের পথ বেয়ে আমরা চলেছি দুঃস্বপ্নের দিকে? কে জানতো জীবনের ভাণ্ডে এত বিষ আছে, এত জ্বালা আর যন্ত্রণা আছে! কে জানতো আমার এই পরিপূর্ণ জীবনের প্রারম্ভেই আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো? বুকে আমার শুধুই প্রতিহিংসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে?

ব্রিজ পার হয়ে কিছুদুর এগোতেই চোখে পড়লো বেশ অনেকটা দূরে ছুটে আসা একটা গাড়ির হেডলাইট। না, একটা নয়, দু'টো গাড়ি। পেছনেও একটা গাড়ি দেখতে পেলাম। সেটা বেশ অনেকটা দুরে তখনও।

গিয়ার বদলে স্পীড আরও কমিয়ে দিলাম। সামনের গাড়িটা ততক্ষণে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাশ ফিরে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। বাঁ'দিকে বিশাল এক খাদ রাস্তার ঠিক ধার ঘেঁষে। সাইড নেবো তার উপায় নেই। জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। ধীর গতিতে সাবধানে এগোতে থাকলাম। বাঁক ঘুরে সামনের গাড়িটা ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। ছুটে আসছে উল্টো-

দিক থেকে। রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া। হঠাৎ সামনের গাড়িটা দিক পরিবর্তন করলো। রাস্তার ডান দিক ছেড়ে মুখ ফিরিয়ে খাদের দিকে ছুটে এল। আমি যথারীতি সিগন্যাল দিলাম। কিছুই কাজ হলো না। আইরিন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ততক্ষণে গাড়িটা চিনতে পেরেছি, একটা মার্সিডিস। ছুটে এল গাড়িটা খাদের দিকে। প্রাণপণে আমি সাইড কাটিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। মার্সিডিসটা তত-ক্ষণে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমার গাড়ির উপর।

প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো সমস্ত পৃথিবীটা।

অন্ধকার ঝলসে উঠলো তীক্ষ্ণ আলোয়।

আলোর পর আবার অন্ধকার।

আমি হারিয়ে যেতে লাগলাম চৈতন্য থেকে দূরে কোথাও।

তারপর কি হয়েছে আমি জানি না।

হাসপাতালে আমার জ্ঞান হলো।

পুরো দু'দিন অজ্ঞান হয়েছিলাম।

সবাই আমাকে বললো আমি নাকি ভাগ্যবান। আইরিনের চেয়ে ভাগ্যবান। কেন না গুরুতর রকম আহত হলেও আমি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছি। কিন্তু আইরিন মৃত্যুর হাত এড়াতে পারেনি।

আইরিন মৃত। আমার সুখ, স্বপ্ন, আশা নিঃশেষ। আমার

একদিনের বিবাহিতা স্ত্রী আইরিন মৃত।

আমি ভাগ্যবানই বটে।

দু'দিন পরের কথা।

হুইল চেয়ারে বসে আছি। নার্স এসে জানালো একজন ভিজিটর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বুঝতে পারলাম না এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না আমার।

নার্সকে আমি মানা করে দিলাম কাউকে আমার ঘরে আসতে দিতে। জাহান্নামে যাক সবকিছু। আমি কারও সাথে দেখা করতে চাই না। কিন্তু সেই লোকটা ক্রমাগত আসতে লাগলো হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত নিস্পৃহতা কেটে গেল আমার।

একটা কৌতূহল পেয়ে বসলো আমাকে।

কে এই অপরিচিত ভিজিটর, সাত-আটবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও যে আবার আমার সাথে দেখা করতে এসেছে? কি চায় লোকটা আমার কাছে?

সিস্টারকে বললাম: ওকে আসতে বলুন। আমি কথা বলবো।

ওর নাম মোশাররফ হোসেন। ক্ষীণ শরীর, গভীর ও বিষণ্ণ

চোখ, লালচে পাতলা চুল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স। পরনে ঢোলা প্যান্ট আর আধ-ময়লা স্টিফ-কলার সাদা শার্ট।

লোকটা নিঃশব্দে আমার বিছানার কাছে এসে বসলো। দুর্ঘটনা ও আমার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো: আপনাকে সব সামলে উঠতে হবে। দরকার হলে আবার বিয়ে-থাও করতে হবে। যে গেছে সে তো আর ফিরবে না।

তা ঠিক। আইরিন আর ফিরবে না। কিন্তু আবার বিয়ে করার এই অযাচিত প্রস্তাবে যেন গা জ্বালা করে উঠলো আমার। বললাম: আপনি কি ঐ কথা বলার জন্যেই এসেছেন?

: না।

মোশাররফ হোসেন মাথা নাড়লো: আমি ঘটক নই, মোল্লা-মৌলভীও নই। আমি আইন-ব্যবসায়ী, উকিল। আপনাকে বন্ধুর মতো একটা বিষয়ে পরামর্শ দিতে এসেছি আমি। কিন্তু পরামর্শ দেয়ার আগে কিছু ব্যাপার আপনার জানা উচিত। হ্যাঁ, কথাগুলো আপনার ঐ অ্যাক্সিডেন্ট নিয়েই। আমার বিশ্বাস সব কথা আপনি জানেন না।

: যেমন?

: বলছি, শুনুন। আপনার গাড়ির সাথে যার গাড়ির কলিশন হয়েছিল তার নাম সৈয়দ জামাল। কোটিপতি বলতে পারেন। সৈয়দনগর উপ-শহরের কাগজের মিল, জুট বেলিং এজেন্সি,

একটা ব্যাঙ্ক আর প্রভিন্সের গোটা ছ'য়েক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক এই সৈয়দ জামাল। যেদিন অ্যাক্সিডেন্টটা হলো সেদিন সৈয়দ জামাল স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রি বেলা মাতাল অবস্থায় সৈয়দ-নগর থেকে মহকুমা শহরের দিকে যাচ্ছিলো। তার মার্সিডিস বেঞ্জ ৩০০ মডেল গাড়িটার ঠিক পেছনে ছিল একটা লাল ফক্সওয়া-গেন। সেটা চালাচ্ছিল সৈয়দনগর থানার ও. সি বোরহান আহ-মেদ। ব্রিজ-টার্মিনালের কাছে তখন গাড়ি চালিয়ে আপনি বিপরীত দিক থেকে আসছেন। মদ খেয়ে সৈয়দ জামালের হাত ছিল বেসামাল। ফুল-স্পীডে গাড়ি চালিয়ে সে এসে পড়লো একেবারে আপনার গাড়ির উপরে, আপনার গাড়ি হাইওয়ে থেকে উল্টে গড়িয়ে গিয়ে পড়লো খাদের নিচে আর একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সৈয়দ জামালের গাড়িটা কোনোরকম রক্ষা পেয়ে গেল। সৈয়দ জামাল বেশ আহত হয়েছে। তার কোমর মচকে গেছে, উরু, হাত কেটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য যে তার সুন্দরী স্ত্রী নেহাল বানুর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। মহিলা চমৎকার বেঁচে গেছে। তাই না?

বললাম: হ্যাঁ, এসবই সত্যি। কিন্তু আপনি কি করে এসব জানলেন?

সামান্য হাসলো মোশাররফ হোসেন। চোখ দু'টির মতো হাসিতেও কেমন একটা বিষণ্ণতা। বললো: কি করে জানলাম সেটা বড় কথা নয়। কথা হলো এসবই সত্যি এবং আপনি ইচ্ছে

করলে সৈয়দ জামালের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়ে মামলা দায়ের করতে পারেন। আমি আপনাকে সাহায্য করবো এবং মামলা জিতিয়ে দেবো।

ঃ মামলা করবো ? কিন্তু কেন ?

এক নম্বর কারণ আপনি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আপনার ক্ষতিপূরণ হওয়া দরকার। দুই নম্বর কারণ যারা টাকার জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে তাদের দেখিয়ে দিন যে দুনিয়াতে এখনও আইন-আদালত আছে,—ইচ্ছে করলেই যা খুশি তা করা যায় না।

মোশাররফ হোসেনকে এখন চিনতে পারলাম। সৈয়দ জামালের প্রতিপক্ষ, হয়তো শত্রু। কোনো সময় হয়তো সৈয়দ জামালের কাছে হেরে গিয়েছিল বা অপমানিত হয়েছিল, এখন আমার দুর্ঘটনার ফাঁক ধরে সৈয়দ জামালকে ঠুকে দিতে চায়। সুযোগ বুঝে পরাজয় ও অপমানের শোধ নিতে চায়।

বললাম ঃ মাপ করবেন। আমি মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলায় যাবো না। গিয়ে কি লাভ ?

ঃ প্রচুর টাকা আপনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। তাছাড়া একটা মাতাল লোকের দায়িত্বহীন ড্রাইভিং-এ আপনার স্ত্রী মারা গেলেন তারও তো প্রতিশোধ আপনার নেয়া উচিত।

আমি চুপ করে রইলাম।

মোশাররফ হোসেন বললো ঃ একটু ভালভাবে চিন্তা করে

দেখুন ব্যাপারটা। মামলা আপনি জিতবেনই। এমন সুযোগ আপনার ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।

বললাম : ভেবে দেখার কিছু নেই মিঃ হোসেন। আপনি এখন আসুন। এখন আমি বিশ্রাম নেবো।

: মামলা তাহলে করছেন না ? বিষণ্ণ হাসি হাসলো মোশাররফ হোসেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললো : যাক গে। আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।

লোকটা চুপচাপ চলে গেল।

ওর জন্যে কেন জানি না দুঃখ হলো। আরও কিছু খবরাখবর পেলাম হাসপাতালে থাকা অবস্থায়ই ওর সম্পর্কে।

লোকটা ঢাকার বাসিন্দা। বছর দুই আগে এখানে এসেছে এবং শহরে প্র্যাকটিস্ করছে। প্র্যাকটিস্ প্রায় নেই বললেই হয়। লোকে বলে ওর আসল কাজ নাকি সৈয়দ জামালের ক্ষতি করার চেষ্টা করা। কেন ও সৈয়দ জামালের পেছনে লেগেছে কেউ তা জানে না। ওর চলাফেরা খুবই রহস্যপূর্ণ। এবার নাকি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ও মরতে গিয়েছিল, খবর পেয়ে সৈয়দ জামাল ছুটে আসে এবং চিকিৎসা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সৈয়দ জামাল নাকি ওকে খুব ভাল একটা চাকরি দিয়ে সৈয়দনগরের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিল কিন্তু মোশাররফ হোসেন তাতে রাজি হয়নি। সে সৈয়দনগরেই আছে এবং সৈয়দ জামালের ক্ষতি করার চেষ্টায় ফিরছে। লোকটা কথা বলে অত্যন্ত কম,

চলাফেরাও সীমিত। রহস্যময় এই লোকটা কেন সৈয়দ জামালের ক্ষতি করতে চায় কেউ তা জানে না।

হাসপাতালে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। ঠিক করলাম হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার জয়েন করবো চাকরিতে। আইরিনকে হারাবার বেদনা হয়তো কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। তবু যে ক'দিন বাঁচি, জীবনকে যথাসম্ভব সুন্দর করার চেষ্টা করবো।

সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সকাল দশটায় হাসপাতালের ডাক্তার মীর্জা আমার চেক্-আপ রিপোর্টগুলো পরীক্ষা করে বলে গিয়েছেন যে দিন তিনেকের মধ্যেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারবো। আমি শাহানা ভাবীকে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠি লেখা মাত্র শেষ হয়েছে এসময় সিস্টারের পিছু পিছু যে লোকটা ঘরে ঢুকলো তাকে সেমুহূর্তে দেখার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

এডভোকেট মোশাররফ হোসেন। লোকটা তাহলে আমাকে দিয়ে সৈয়দ জামালের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লাগাবার আশা এখনও ত্যাগ করেনি!

মোশাররফ হোসেনকে দেখে বিরক্ত হলাম বলা বাহুল্য। আমি মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম আর স্বচ্ছন্দে সে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো।

বললো : এখন কেমন আছেন ?

বললাম : ভালোই।

: আমাকে নিশ্চয়ই দেখবেন বলে আশা করেননি ?

: হ্যাঁ। আমার ধারণা ছিল আপনি মামলার ব্যাপার নিয়ে আর কোনোদিন আসবেন না।

মোশাররফ হোসেন একটু হাসলো। বললো : আমি কেন এসেছি আপনি জানেন ?

: জানি বৈকি। আপনি এসেছেন সৈয়দ জামালের বিরুদ্ধে মামালা লাগাবার জন্যে আমাকে পরামর্শ দিতে।

: না।

মাথা নাড়লো মোশাররফ হোসেন : আমি এসেছি আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে।

: দুঃসংবাদ ?

: হ্যাঁ। সৈয়দ জামাল আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। চমকে উঠবেন না, শুনুন, শুনুন। তার অভিযোগ আপনি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং বেআইনী ভাবে গাড়ি চালিয়ে সৈয়দ জামালের শরীর ও সম্পত্তির ক্ষতি করেছেন।

: মিথ্যে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : সবই মিথ্যে। আমি যে নিরপরাধ একথা সবাই জানে। মদ আমি জীবনে কখনও স্পর্শই করিনি।

আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম রাস্তার বাঁ পাশ ধরে। অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে সম্পূর্ণ সৈয়দ জামালেরই দোষে! ক্ষতি ওর কিছুমাত্র হয়নি। ক্ষতি বরং আমার হয়েছে, আমার চরম ক্ষতি···

ঃ হ্যাঁ, আপনি একদিনের বিবাহিতা স্ত্রীকে হারিয়েছেন অ্যাক্সিডেন্টে, নিজে আহত হয়েছেন মারাত্মক রকম, আপনার গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু, মোশাররফ হোসেন একটু হাসলো। কিন্তু কে আপনার কথা বিশ্বেস করবে? হাসপাতালের ডায়েরিতে কি লেখা আছে জানেন? লেখা আছে আপনাকে যখন অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তখন আপনার মুখে, কাপড়ে হুইস্কির গন্ধ ছিল···

ঃ হুইস্কি! মদ? মিঃ মোশাররফ, আমি আর্তকণ্ঠে বলি ঃ মদ আমি কোনোদিন স্পর্শই করিনি···বিশ্বেস করুন···

ঃ তা বললে চলবে কেন? হাসপাতালের সিনিয়র হাউস সার্জেন ডঃ মীর্জা নিজে ডায়েরিতে একথা রিপোর্ট করেছেন··· দরকার হলে তিনি কোর্টে হলফ করে সেটা বলবেন!

কোর্টে লোকারণ্য।

মাননীয় বিচারক বসে আছেন মঞ্চে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ ডাক্তার মীর্জা।

সাদা দাড়ি। সাদা চুল। সাদা লম্বা কোট পরিহিত।

চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বিনীত দৃষ্টি। বিচারকের দিকে

ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন : মৃত্যুর দুয়ার থেকে যাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি, ইয়োর অনার, ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই দুঃখিত যে সেই পেশেন্টই এই মামালার আসামী। আসামী খুবই সজ্জন ব্যক্তি বলে আমার ধারণা। কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়নীতির খাতিরে একথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে আসামী যখন অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে আনীত হয় তখন তার মুখে ও কাপড়ে হুইস্কির গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। আমি নিজে সে গন্ধ পেয়েছি।

দর্শকদের মৃদু গুঞ্জরন শোনা গেল। সবারই দৃষ্টি আমার উপর। বুঝতে পারলাম সব লোক ঘৃণাভরে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

পরবর্তী সাক্ষী থানার ও. সি. বোরহান আহমেদ। বোরহান আহমেদ আদালতকে বললো : আমি নিজে ঘটনাস্থলে সে রাতে উপস্থিত ছিলাম। আসামী অস্বাভাবিক স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল। সৈয়দ জামাল সাহেব তাকে যথাসময় সিগ্‌ন্যাল দেন। কিন্তু সে সিগ্‌ন্যালে কোনো ফল হয়নি। আসামী রং সাইডে গাড়ি চালিয়ে সৈয়দ জামালের মার্সিডিসের সাথে কলিশন ঘটায়। কলিশন হবার পর আমি সৈয়দ জামাল সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে মার্সিডিস থেকে উদ্ধার করি।

পরবর্তী সাক্ষী পুলিশের জমাদার আরিফ হোসেন। সেও হলফ করে প্রায় একই কথা বললো।

আমাকে আমার পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হলো। আমার উকিল মোশাররফ হোসেন কোর্টকে বলার চেষ্টা করলো যে

অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে সৈয়দ জামালই এককভাবে দায়ী। দুর্ঘটনায় তার কোনো ক্ষতিই হয়নি বলতে গেলে। কিন্তু আসামী তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছে এই দুর্ঘটনায়। এরপর আসামীর ক্ষতি সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোশাররফ হোসেন মাননীয় বিচারককে বললো: ইয়োর অনার, আসামী একজন দায়িত্বশীল অ্যাকাউন্টেট। তার অপূরণীয় ক্ষতির জন্যে সৈয়দ জামালই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। অর্থ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা যদি বিচারের মাপকাঠি না হয় তো বলবো সৈয়দ জামালের স্বভাবে মানবিক গুণের নিতান্তই অভাব রয়েছে। আসামীর এতবড় সর্বনাশ তারই হাত দিয়ে ঘটেছে। আসামীর সর্বনাশ করেও সৈয়দ জামাল ক্ষান্ত হয়নি। সে চায় আইনের নাম করে আসামীকে দোষী প্রতিপন্ন করতে। ইয়োর অনার, আইনের এমন খেলাপ আর কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। এ হলো নিজের দোষ ঢাকার জন্যে একটা হীন ষড়যন্ত্র। আইন ও বিচারের দোহাই দিয়ে আসামীকে এই হীন ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি হুজুরের কাছে প্রার্থনা জানাই। আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

বিচারের শেষ দিন।

বাদী পক্ষের উকিল গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সৈয়দ জামালের পক্ষ সমর্থন করে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিল। বললো:

ইয়োর অনার, সৈয়দ জামাল এখানকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং সমাজকর্মী।

বিচারক মৃদু হেসে বললেন: বাদী সম্পর্কে এসব কথাই আমরা জানি।

বাদী পক্ষের উকিল বিচারকের হাসিতে যোগ না দিয়ে তেমনি গম্ভীরভাবে বললো: হুজুরের কিছুই অজানা নেই। হুজুর নিশ্চয় এটাও জানেন এই দুর্ঘটনায় সৈয়দ জামাল সবিশেষ আহত হয়েছেন, তাঁর দামী মার্সিডিস গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে এবং সৈয়দ জামালের তরুণী স্ত্রী এই দুর্ঘটনায় নিদারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছেন। হুজুর, এসবই হলো একজন ভ্রষ্ট চরিত্রের মাতাল গাড়ি চালকের দায়িত্বজ্ঞান হীনতার ফল।

আদালত গৃহের দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জরন শুরু হলো। অনুভব করলাম প্রতিটি লোক সৈয়দ জামালের অন্ধ ভক্ত। ওদের ঘৃণিত দৃষ্টি বারবার এসে আছড়ে পড়ছে আমার উপর।

বিচারক দর্শকদের শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর কক্ষের পিন-পতন নিস্তব্ধতার ভেতর তাঁর রায় ঘোষণা করলেন।

সৈয়দ জামালের ঠোঁটে আবছা হাসি ফুটে উঠলো। আমাকে আইনের কঠোরতম শাস্তিই দেয়া হয়েছে। পাঁচ মাসের জেল। দশ হাজার টাকা জরিমানা।

আপীলে কোনো ফল হয়নি। অর্থদণ্ড দিয়ে জেল খেটে এই কিছুদিন আগে আমি বেরিয়ে এসেছি। আইন এখন আমি

নিজের হাতে তুলে নিয়েছি। আইরিনের মৃত্যুর পরও বাঁচবার একটা ভদ্র ব্যবস্থা ছিল। সৈয়দ জামাল সেটাও কেড়ে নিয়েছে। চাকরি আমার আগেই গেছে। এখন জেলখাটা দাগী আসামীকে কে চাকরি দেবে? এখন সমাজে আমার জন্যে নির্দিষ্ট আছে শুধু ঘৃণা আর পরিহাস। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচবার জন্যে আমি মদ ধরেছি। মদ এখন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। মদ খেয়ে আমি জীবনের সব গ্লানি দুঃখ আর বেদনা ভুলে যেতে চাই।

কিন্তু না, প্রতিশোধ নেবার কথা আমি ভুলতে পারি না। মদ খেয়েও না।

দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম।

এসবই হলো অতীত বৃত্তান্ত।

এখন নতুন করে শুরু হয়েছে জীবন-যন্ত্রণা। কাল এই হোটেল থেকে চলে যেতে হবে অন্যত্র।

এই শহর আমাকে ভয় পায়। ঘৃণা করে। কিন্তু কোথায় যাবো আমি এই শহর ছেড়ে? সৈয়দ জামালের মৃত্যুর জন্যে আমি বেঁচে আছি। কিছুদিন, আরও কিছুদিন যে করে হোক আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

আট

আয়েন উদ্দিনের হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম পরদিন সকাল-বেলা।

হাঁটতে লাগলাম রাস্তা ধরে সুমুখে।

মফঃস্বল শহর হলেও পার্বত্য-এলাকার স্বাস্থ্য-নিবাস বলে শহরটা বেশ উন্নত ধরনের। অনেকগুলো ভাল হোটেল আছে। রাস্তাঘাটগুলো প্রশস্ত। বাঁধানো। বাড়িগুলো ছিমছাম পরিষ্কার।

সেই মুহূর্তে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল একটা কোনো আশ্রয় খুঁজে নেয়া। ভাল সব ক'টা হোটেলই পড়েছে নদীর ধারে। নদীর ধার ধরে হাঁটতে লাগলাম।

সামনে পড়লো গ্র্যাণ্ড হোটেল। চমৎকার দোতালা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। টালির ছাদ। পোর্টিকোর নিচে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গেটে উর্দি আঁটা দারোয়ান। রিসেপশনে ব্যস্তসমস্ত লোকজন।

আমি রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াতেই রিসেপশনিস্ট অবাক হয়ে

আমার দিকে তাকালো। আমি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আমার প্রয়োজনীয় কথাটা খুলে বললাম। একখানা ঘর চাই সিঙেল সিটেট্। দরকার হলে মাস খানেকের আগাম টাকা দিতেও রাজি আছি জানিয়ে দিলাম।

রিসেপশনিস্ট শুধু বললো : আপনাকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে স্যার। আমি ম্যানেজারের ঘর থেকে আসছি।

বুঝলাম লোকটা আমাকে চিনেছে। ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাবে তখুনি বুঝে ফেললাম। দ্বিধামাত্র না করে সরে পড়লেই হতো। কিন্তু কেন জানি না সব যুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে মন আশাবাদী হয়ে উঠলো। মনে হলো সব মানুষই কি আর সৈয়দ জামালের কেনা? সবাই কি আয়েন উদ্দিন?

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর রিসেপশনিস্ট ফিরে এল। ভদ্র ও বিনীত ভঙ্গিতে সে জানালো গ্র্যাণ্ড হোটেলে আপাততঃ কোনো ঘর খালি নেই। আমরা দুঃখিত।

আবার রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে আবার এলাম একটা হোটেলের সামনে। দু'টো সবুজ ঘাসময় টিলার আড়ালে চমৎকার ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে লাল রঙের হোটেলটা। এখানকার ম্যানেজার আমাকে শুধু তাড়িয়েই দিল না, টেলিফোন তুলে, বুঝলাম, বোরহান আহমেদকে আমার বর্তমান অবস্থাটা জানিয়েও দিল।

প্রায় সব ক'টা হোটেল ঘুরলাম। কোনো ফল হলো না।

সৈয়দ জামাল ও বোরহান আহমেদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাকে জায়গা দেবার সাহস এখানকার কোনো লোকের নেই।

টাকার ক্ষমতা অনেক। সৈয়দ জামালের গাড়ির ধাক্কা খেয়ে আইরিন মরেছে। সৈয়দ জামালের কৌশল ও প্রতিপত্তির কাছে হেরে গিয়ে পাঁচ মাস জেল খেটেছি আমি এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। এর পরও যদি এগোই, বুঝতে পারলাম, ধ্বংস অনিবার্য। দু'দিন কুকুরের মতো ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায়। কেউ আমাকে আশ্রয় দিল না। সৈয়দ জামালের রাজ্যে আমার স্থান নেই। একটা পথই এখন খোলা আছে।

নিজেকে নিজে ধ্বংস করার পথ।

সন্ধা হয়ে এসেছিল। একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। ঝির ঝির বাতাস বইছে। কিছু দূরে প্রশান্ত অঙ্গন-ঘেরা একটা পরিচ্ছন্ন বাড়ি। ক্লাব। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে এক একটা ঘরে। স্বপ্নময় পরিবেশ। বাঁ'দিকে এগোলে নদী। দু'পাশের উঁচু পাড় ভেদ করে ছোট্ট পাহাড়ী নদীটা কখনও খাদের ভেতর দিয়ে কখনও সমতল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীতে নৌকা চলাচল নেই। লোকে এই নদীকে বলে ভুবন নদী। নদীটার নাম ভুবন কেন হলো বোঝা কঠিন। পাহাড়ীয়া এই নদীর বাঁকে বাঁকে তীব্র মোচড়। তীরে ঘন অরণ্য। পায়ে পায়ে ফাঁদ। উঁচু পাড় থেকে গড়িয়ে নিচে পড়লে রক্ষা নেই। নির্ঘাত মৃত্যু।

এই নদীর নাম হওয়া উচিত ছিল, ভুবন নয়, মরণ নদী।

আলোকিত উজ্জ্বল ক্লাব ঘরের দিকে একবার তাকালাম, তারপর এগিয়ে গেলাম নদীর দিকে। খুঁজতে লাগলাম সবচে' উঁচু কোনো জায়গা যেখান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারলে পাওয়া যাবে নিশ্চিন্ত মৃত্যুকে।

এগিয়ে গেলাম সামনে।

চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। অন্ধকার। বাতাস বইছে। বহুদূরে স্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে আলোময় ক্লাবঘরটা।

কে যেন কাকে ডেকে উঠলো। বোধহয় পেছনের রাস্তায়। আমাকে? হাসলাম। আমাকে পেছন থেকে ডাকার কেউ নেই। আমাকে সুমুখ থেকে ডাকছে মৃত্যু। আমি এগোতে লাগলাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম উঁচু পাড়ে। অনেক নিচে নদী। তীব্র স্রোত। পাথরে ঠোক্কর খেয়ে গর্জে উঠছে।

নিজেকে নিজে অনুভব করলাম একবার। না, প্রতিটি স্নায়ু এখনও সজাগ। একটুও অবশ লাগছে না মন। মনেই হচ্ছে না আমি মরতে চলেছি।

কিন্তু মরা ছাড়া আমার উপায় কি? দীর্ঘশ্বাস চাপলাম একটা। তাকালাম নিচের দিকে ঠিক তখুনি একটা টর্চলাইটের আলো এসে পড়লো চোখে। চমকে উঠলাম।

একটা হাত এসে লাগলো পিঠে। কেউ একজন বললো: আপনাকে ঠিক মতো ফলো না করলে দেখছি সর্বনাশ করতেন সায়েব। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ একজন বন্ধু। বোধহয় একমাত্র বন্ধু। মোশাররফ হোসেন।

হোসেন বললো : আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না, চলুন।

নয়

: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাহমুদ সাহেব।

কেরানীটা দাঁত বার করে হাসলো : আপনার চোরা কুঠুরীর খবর দুনিয়ার কেউ জানবে না। আমিও স্যার আপনার মতোই সৈয়দ জামালের একজন বন্ধু কি না···

হঠাৎ লোকটা টান দিয়ে জামাটা খুলে ফেললো। চোখ দু'টি হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলছে। অনাবৃত বুকের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। একটা গভীর ক্ষতের দাগ···

: দেখেছেন স্যার···

কেরানীটা ফিসফিস করে বললো : এই চিহ্নের স্মৃতি ভোলা যায় বলুন? আমার ছোট মেয়েটাকে তিনি ভোগ করলেন, আমি সামান্য কিছু দাম চেয়েছিলাম স্যার, তো তিনি নিজের হাতে আমার বুকে এই দাগ দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, সৈয়দ জামাল সাহেব তখন মাতাল ছিলেন। মরেই যেতাম স্যার···উকিল সাহেব আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

কেরানী হাসান আলী হাসলো : আপনার মতো মামলাও

করেছিলাম। মামলায় হার হয়েছিল। গরীব মানুষ স্যার, রক্ত ঠাণ্ডা···তারপর ওসব প্রতিশোধ নেয়া-টেয়ার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আপনি স্যার যদি চেষ্টা করেন, আছি আপনার সাথে··· খোদার কসম স্যার···আমার নষ্ট মেয়েটার কসম···আছি আপনার সাথে,···

হাসান আলী হা হা করে হাসলো। লোকটা বোধহয় আমার চেয়েও জেদী, অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়। গায়ের ফর্সা রঙটা পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। ধূর্ত চোখ-মুখ। বেশ শক্ত-সমর্থ শরীর।

দেখলেই চেনা যায় লোকটা যাকে ছোবল দেবে তার রক্ষা নেই।

কিছুক্ষণ বকবক করে চলে গেল হাসান আলী। বিছানায় শুয়ে রইলাম দুপুর পর্যন্ত। ক্লাবঘরের ঠিক পেছনের একটা গলির মোড়েই উকিল মোশাররফ হোসেনের বাড়ি। নিজে থাকে আর স্টেশনারী স্টোর্সের কেরানী হাসান আলী।

দু'জনই সৈয়দ জামালের প্রাণের শত্রু। চরমতম সর্বনাশ দেখতে চায় ওরা দু'জনই।

ভাগ্যের কি বিচিত্র খেলা যে একই প্রয়োজনে তিনজন এসে জুটেছি এই আশ্রয়ে। মোশাররফ হোসেন আইনের প্যাঁচে ফেলে সর্বনাশ করতে চায় সৈয়দ জামালের, আর আমি নিজের হাতেই তুলে নিয়েছি আইন।

দু'দিন বিশ্রাম নিলাম। আমার প্ল্যান অত্যন্ত সহজ। আমি আগে সৈয়দ জামালকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে চাই। দুম্ করে মেরে ফেললে কি লাভ? মেরে ফেলার আগে মৃত্যুরও বাড়া যন্ত্রণা দিতে চাই। তারপর নিজের হাতে খুন করতে চাই ওকে।

সন্ধ্যাবেলা মোশাররফ বেরিয়ে গেল। এসময় সে বেরিয়ে যায়। ফেরে এগারোটার দিকে। নিজের ঘরে পায়চারি করলাম কিছুক্ষণ। আমি আর কোথায় যাই? আমার দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে। হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়লো। মনের ভেতর দুলে উঠলো সেই জ্বালা।

এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের কাছে বসলাম। ডায়াল করলাম দু'বার সৈয়দ জামালের নম্বরে। পাওয়া গেল না। তৃতীয়বারে মিহি একটা গলা জেগে উঠলো টেলিফোনে।

ঃ কে বলছেন?

ঃ আমার নাম মাহমুদ। সৈয়দ জামালকে ধরতে বলুন।

লোকটা উত্তেজিত স্বরে বললো ঃ মাহমুদ? আচ্ছা ধরুন, দেখছি।

বুঝলাম টেলিফোন ধরেছিল জসিম। রিসিভার কানে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর রিসিভারে একটা মোটা ভারি গলা শোনা গেল ঃ হ্যালো।

সৈয়দ জামালের গলা। বললাম ঃ আমি মাহমুদ বলছি।

ঃ তুমি কি চাও মাহমুদ ?

সৈয়দ জামালের গলার স্বরে বিস্ময় ঃ খোদার দোহাই লাগে, বলো তুমি কি চাও ?

ঃ আপাততঃ এটা আপনাকে জানাতে চাই যে আমি এখনও সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি···আপনার চেলা চামুণ্ডারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমাকে ওরা অজ্ঞান অবস্থায় গোর-স্থানে ফেলে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমি মরিনি। আপনাকে হত্যা করবো বলে এখনও আমি বেঁচে আছি···হ্যালো···

ঃ কেন তুমি আমার পেছনে লেগেছো মাহমুদ ?

সৈয়দ জামাল আহত গলায় বললো ঃ তোমার কোনো ক্ষতি হোক এ তো আমি কখনও চাইনি !

ঃ তাতো বটেই ! আপনি তো যাকে বলে মহৎপ্রাণ মহা-পুরুষ···আপনাকে দিয়ে কি এসব নোংরা কাজ সম্ভব ? যাহোক ···একটা কথা জামাল সাহেব···

ঃ বলো···

ঃ ধরুন, আপনি যখন শোবার ঘরে ঘুমাতে গেছেন তখন যদি আপনার বিছানার উপর দেখতে পান একটা চন্দ্রমণি গোক্ষুর সাপ···কেমন লাগবে স্যার ?

ঃ মাহমুদ···সৈয়দ জামাল গর্জে উঠলো। কিন্তু গলায় হতা-শার স্বর চাপা দিতে পারলো না।

হাসতে হাসতে বললাম ঃ অথবা মনে করুন সৈয়দনগর

থেকে গাড়ি করে আসছেন রাত্রিবেলা···সেই রাতের মতো···মদ খেয়ে মাতাল হয়ে···ধরুন এসময় আপনার ইঞ্জিন ফেটে চৌচির হয়ে গেল···তখন ?

ঃ আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না মাহমুদ ! মৃত্যুর ভয় আমি করি না।

সৈয়দ জামাল উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ঃ তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই তুমি সাজা পেয়েছো, হয়তো আরও পাবে। মনে রেখো, সৈয়দ জামাল একটা তৃতীয় শ্রেণীর জেলখাটা দাগী আসামীর শাসানীকে ভয় করে না···

ঃ তাহলে শেষ কথাটা শুনুন স্যার···আমি ফুর্তির গলায় বলি ঃ আপনি কাল যখন বউকে সাথে নিয়ে ক্লাবে আসবেন তখন একটা পাগলা কুকুর আপনার উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে···সাবধান কিন্তু !

সৈয়দ জামাল এক মুহূর্ত নিশ্চুপ। তারপর বললো ঃ তুমি কোত্থেকে কথা বলছো মাহমুদ ?

ঃ কেন ! ধরতে চান আমাকে ?

ঃ খোদার কসম বিশ্বাস করো ওরকম কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি ভাবছি একসময় সব কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবো।

ঃ তার কিচ্ছু দরকার নেই। যা বোঝার আমি বুঝেছি। আপনি তৈরি থাকবেন সৈয়দ জামাল !—টেলিফোন ছেড়ে দিলাম

কলঙ্কিনী

হাসতে হাসতে।

রাত্রিবেলা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসলাম আমার চোরা কুঠুরীতে।

আমি একা।

না, সাথে আমার দুঃস্বপ্ন আছে।

দশ

চোরা কুঠুরীর জানালা দিয়ে পরদিন সারা বিকেল, সন্ধ্যা অপেক্ষা করলাম ক্লাবের দিকে তাকিয়ে।

না, কেউ আসেনি। সন্ধ্যা উতরে গেল। ক্রমে ক্রমে রাত এগারোটা। সৈয়দ জামাল ক্লাবে এল না।

হাসলাম নিজের মনে।

সৈয়দ জামাল ভয় পেয়েছে। বিছানায় শুতে গিয়ে ভয়, গাড়ি চালাতে গিয়ে ভয়, ক্লাবে আসতে ভয়। একটা অশুভ কল্পনার বিরুদ্ধে এখন যুদ্ধ করছে সৈয়দ জামাল।

হুমকি দিয়েছিলাম। তাই আজ ক্লাবে আসেনি। হয়তো ক্লাবে আসার কথাই ছিল না আজ। তবু মন বললো—সৈয়দ জামাল ভয় থেকে, আশঙ্কা থেকে, মৃত্যু থেকে কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে।

হাসলাম নিজের মনে। পরদিন বেরোলাম শহরের দিকে। কসাইটার সাথে আমার আগে পরিচয় ছিল না। বড় বদমেজাজী। কিন্তু কিছু টাকা ফেলে দিলাম আর খুশি হয়ে উঠে আমাকে

বসতে বলে সে ভেতরে চলে গেল। ফিরলো ছু'টো খাপে ঢাকা ছুরি নিয়ে।

ছু'টোই ইস্পাতের ফলা। কাগজের মতো পাতলা। শক্ত।

কসাইটা বললো ছোট বাঁটটা দিয়ে. এর আগে ছু'টো 'মার' হয়েছে। বড়টা আন্‌কোরা নতুন। ওটাই নিয়ে যান।

বড়টাই নিলাম। কসাই চামড়ার খাপ সমেত ছুরিটা আমাকে দিয়ে দিল। বললো নিজের হাতে তৈরি জিনিস। একেবারে খাঁটি।

খাঁটি জিনিসেরই দরকার আমার। বাজারে গিয়ে আরও ছু'-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনলাম। যেমন কয়েক গাছি শক্ত কর্ড, একবোতল পেট্রল, কিছু কাচের পাতলা শিশি ও ম্যাচ-বাক্স।

জিনিসগুলো কিনে ঘরে রেখে দিলাম, হাসান আলীকে কিছু টাকা আগাম দিলাম একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি কেনার জন্যে। দিন পনেরোর মধ্যেই গাড়িটা চাই। জিনিসটা চোরাইমাল হলে বিপদে পড়বো। হাসান আলীকে এ বিষয়ে সর্তক করে দিলাম।

সন্ধ্যা বেলায় টেলিফোন করলাম সৈয়দ জামালকে।

আগের মতোই জসিম ধরলো।

বললাম ঃ সৈয়দ জামালকে চাই।

ঃ নেই তিনি।

ঃ কোথায় আছেন?

ঃ ঢাকা। দরকার থাকলে পরে রিঙ করবেন।

টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। মোশাররফ হোসেন আমার ঘরে বসে আছে শূন্য দৃষ্টি মেলে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে হেসে বললো ঃ এভাবে লাভ হচ্ছে কিছু ?

বললাম ঃ আপনি কি করতে বলেন ?

মোশাররফ হোসেন বললো ঃ আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে বলি। না, না···খুন-খারাবির কথা বলছি না। ওটা আমি ঘৃণা করি। যা কিছু করেন আইনের আশ্রয়ে। অপেক্ষা করুন, কোনো না কোনো একটা সুযোগ মিলে যাবেই।

ঃ তা হয়তো যাবে।

আমি বললাম ঃ কিন্তু আমি ওসব সুযোগের পরোয়াই করি না হোসেন সাহেব। আমি একটা গাড়ি কিনবো। কিনে সৈয়দ-নগরের রাস্তায় চালাবো। সুযোগ পাই তো সোজা চালিয়ে দেবো সৈয়দ জামালের গাড়ির উপর। নয়তো একটা ঝকঝকে ছুরি কিনেছি ওটা ব্যবহার করবো। বুঝলেন ?

গম্ভীর হয়ে উঠলো মোশাররফ হোসেন। বললো ঃ আপনার মাথা যে খারাপ হয়েছে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এসব পাগলামি রেখে আপনি আমার কথা শুনুন। আসুন খুঁজে দেখি একটা কোনো আইনের রাস্তা মেলে কিনা।

ঃ কেন, সৈয়দ জামালকে খুন করি এটা আপনি চান না ?

ঃ না।

: কিন্তু আপনি নিজেও তো বলেন সৈয়দ জামাল আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ ?

মোশাররফ হোসেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো। বললো : এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। সৈয়দ জামাল যে আমার কত বড় ক্ষতি করেছে তা কল্পনাও করতে পারবেন না মাহমুদ সাহেব। ওকে আমি ছাড়বো না। আজ হোক কাল হোক শয়তানকে উচিত সাজা আমি দেবোই।

থামলো মোশাররফ হোসেন। বললো : কিন্তু আইনের বাইরে আমি যেতে চাই না। যা কিছু অবৈধ, বেআইনী তাকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি। নিজেকেও আমি ঘৃণা করি মাহমুদ সাহেব।

মোশাররফ হোসেনের চোখও জ্বলে উঠলো অবিকল হাসান মিঞার চোখের মতো। একই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছি আমরা। পার্থক্য, আমি সব সীমার বাইরে চলে এসেছি আর মোশাররফ হোসেন এখনও আইনের ভেতর থেকে প্রতিশোধ স্পৃহা মেটাবার কথা ভাবছে।

মোশাররফ হোসেনের চোখ-মুখ এক অকৃত্রিম বহ্নিশিখায় রক্তিম হয়ে উঠলো। বললো কপালই আমার মন্দ মাহমুদ সাহেব। এই দু'বছর ধরে কত চেষ্টাই না করলাম, একবারও পারলাম না। লোকটা দারুণ ভাগ্যবান।

এগারো

সৈয়দ জামাল ভাগ্যবানই বটে। নেহাল বানুকে দেখলে একথা স্বীকার করতেই হয়।

ক্লাব-ঘরটার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম।

ভোর আটটার রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘাসের উপর তখনও শিশির টলমল করছে। এখানে ওখানে শীতল ছায়া। ক্লাবের প্রশস্ত লনের শেষ মাথায় কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো বাতাসে ঝিরঝির করছে।

নেহাল বানু সম্পূর্ণ একাকি দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর নিচে।

পেছনে জিমনাশিয়ামের বিশাল শেড। কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে রাস্তা। দোকান।

নেহাল বানুর শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ছে। নেহাল বানুকে দেখলে স্বীকার করতেই হয় সৈয়দ জামাল একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি।

লম্বা, ছিপছিপে শরীর।

সরু কোমরের উপর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ যেন ছোবল দিতে উদ্যত এক নাগিনীর ফণা।

আটসাঁট করে পরা শাড়ি ভেদ করে ফুটে উঠেছে নিটোল বক্ষ-সৌন্দর্য।

ঢলঢলে লম্বা ধাঁচের মুখ।

বিন্দু বিন্দু কোমলতা আর লাবণ্য দিয়ে যেন তৈরি করা হয়েছে নেহাল বানুর যৌবন-সমৃদ্ধ শরীর।

যে কোনো পুরুষ মানুষেরই বুকের রক্ত উন্মাদ হয়ে উঠবে এই নারীকে একান্ত করে পাবার পিপাসায়।

সৈয়দ জামাল ভাগ্যবানই বটে।

নেহাল বানুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘামে ভেজা এক রকমের মিষ্টি মাদকতার গন্ধ পেলাম ওর শরীর থেকে।

নেহাল বানু আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকালো। আমাকে এই ভোরবেলা ক্লাবের অঙ্গনে দেখবে এটা হয়তো সে আশা করেনি।

আমি কি আশা করতে পেরেছিলাম যে আমার ঘরের চোরা-জান্‌লা দিয়ে এসময় ওকে দেখতে পাবো?

আমি নিজে যেচে এগিয়ে এসেছি। আমার অবাক লাগছিল যে সৈয়দ জামাল যখন কাল থেকে সৈয়দনগরের বাইরে,—ঢাকায়, তখন নেহাল বানু এই সকালবেলা এখানে কেন?

কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবার পর নেহাল বানু বললো: আপনি?

বললাম ঃ আমারও একই প্রশ্ন।

নেহাল বানু একটু হাসলো। বললো ঃ সময় কাটাতে আমি প্রায়ই এখানে আসি। আজ সন্ধ্যাবেলা এখানে 'ফ্যান্সি শো' হবে। আমি উদ্যোক্তাদের একজন বলে সকাল থেকেই এখানে চলে এসেছি।

বললাম ঃ আমার কাহিনী একটু ভিন্ন। আমি আসতে চাই-নি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমাকে টেনে এনেছে।

নেহাল বানু গর্বিত চোখ দু'টি তুলে বললো ঃ অর্থাৎ সৈয়দ জামালকে একহাত দেখাতে চান আপনি। সেই পুরানো ঘটনা।

ঃ হ্যাঁ। সুযোগের অপেক্ষায় আছি, বুঝতেই পারছেন।

রাগ করলো না নেহাল বানু। বললো ঃ খুব ঘৃণা করেন আপনি সৈয়দ জামালকে ?

বললাম ঃ প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

বাতাসে নেহাল বানুর শাড়ির আঁচল উড়তে লাগলো। আমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো নেহাল বানু। তার দৃষ্টিতে ঘৃণা বা রাগের চিহ্ন ছিল না। কেমন একটা চাপা লোভ ফুটে বেরোচ্ছিল নেহাল বানুর মদির নয়ন থেকে। তার নিঃশ্বাস একটু একটু কাঁপছিল।

বললাম ঃ বুড়ো সৈয়দ জামালের সাথে আপনাকে একটুও মানায়নি নেহাল বানু।

: আপত্তিকর কথা বলবেন না মাহমুদ সাহেব। সৈয়দ জামাল আমার স্বামী। তার সম্পর্কে আর একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন।

: আহা রাগ করছেন কেন? সৈয়দ জামালের প্রচুর টাকা আর প্রতিপত্তি আছে সত্যি। কিন্তু বয়স? শক্তি আর যৌবন? আপনার চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে যে কোনো পুরুষই বুঝতে পারে আপনি···আপনি অসুখী···

নেহাল বানু হাসলো। বললো: আপনি ভাবছেন সৈয়দ জামালের টাকার মোহেই ওকে আমি বিয়ে করেছি?

হ্যাঁ: এবং আপনি অসুখী।

নেহাল বানু কোনো কথা বললো না। একবার কঠোরভাবে তাকালো আমার দিকে। তারপর হাঁটতে শুরু করলো জিম্‌না-শিয়াম শেডের দিকে।

আমি ওকে অনুসরণ করলাম। মস্ত জিম্‌নাশিয়াম শেডের বারান্দাটাকে লাগছিল প্রাচীন কোনো যাদুঘরের মতো। তেমনি ধুলোময় আর নির্জন। আমি অনুসরণ করছি দেখে বারান্দার শেষ প্রান্তে থমকে দাঁড়ালো নেহাল বানু। বললো: আমাকে 'ফলো' করছেন কেন? কি চান আপনি?

বললাম: আমার প্রশ্নের জবাব চাই।

নেহাল বানু বললো: আপনি অত্যন্ত অভদ্র। মহিলাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হয় আপনি জানেন না।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো: যদি আপনার কথাই সত্যি

হয়···আমি যদি অতৃপ্ত আর অসুখীই হই তাতে আপনার কি ?

আমি ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। নেহাল বানুর উন্নত বুক উঠছে নামছে ভীরু কপোতের মতো। ওর চোখ-মুখ ভয়ে অথবা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

বললাম : আপনি ঠিকই ধরেছেন নেহাল বানু। অহেতুক আপনাকে বিরক্ত করছি আমি। কোনো ভদ্র মহিলার সাথে এ রকম ব্যবহার করা খুবই অনুচিত। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ কি আর বলা যায় আমাকে ? ভাগ্যের সাথে জুয়া খেলতে বসেছি আমি জীবনপণ করে। আপনিই বলুন সাধারণ মানুষের ভদ্র ব্যবহার কি আশা করা উচিত আমার কাছ থেকে ? বলুন ?

নেহাল বানু সেই রকম লোভাতুর মদির চোখ দু'টি তুলে নিঃশ্বাস আস্তে চেপে থেমে থেমে বললো : সব কথাই স্বীকার করলাম। এরপর আপনি কি চান ?

: নিজের কানে আপনার মুখ দিয়ে এটা শুনতে চাই যে আপনাকে সুখী করার ক্ষমতা সৈয়দ জামালের নেই। আমি আপনাকে দেখিয়ে দুনিয়ার সব মানুষকে বলতে চাই যে টাকা, ক্ষমতা আর কৌশল সব করতে পারে কিন্তু হৃদয় জয় করতে পারে না।

নেহাল বানু আমার এই কথার জবাব দিল না। শুধু বললো : আপনার ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে মাহমুদ সাহেব। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে চলে যান।

ঃ আপনি তাহলে আমার মঙ্গল চান ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কেন ?

বিচিত্র এক ধরনের হাসি হাসলো নেহাল বানু। এই হাসি যে কোনো পুরুষকে পাগল করে তুলতে পারে তীব্র কামনায়। আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে নেহাল বানু বললো ঃ কেন ? মনে করুন আপানার স্বাস্থ্য শ্রী আর বয়স আমাকে সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। মনে করুন অকালে আপনি জীবন হারাবেন তা আমি চাই না।

আমি ওর সরু কোমরের দু'পাশে আমার হাত রাখলাম। কিছুটা আহত আত্মাভিমানে, কিছুটা স্পর্শকাতরতায় নেহাল বানু শিউরে উঠলো। কিন্তু অনুভব করলাম ওর শরীর পুড়ে গেল আমার হাতের স্পর্শে। নাকে, কপালে জমে উঠলো চকচকে ঘাম। নেহাল বানুর চোখে-মুখে তীব্র ভয়, সেই সাথে কামনার আবেগ। আমার বলিষ্ঠ শরীর হয়তো ওকেও জাগিয়ে তুলেছে।

আমি ওকে আকর্ষণ করলাম। ও বাধা দিল। বললো ঃ প্লিজ ! তুমি চলে যাও।

বললাম ঃ আমাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করো না নেহাল বানু।

ঃ প্লিজ !

নেহাল বানু চারদিকে তাকাতে লাগলো ভয়ে ভয়ে। বললো ঃ সৈয়দ জামালকে তুমি চেনো না মাহমুদ। ওর স্ত্রীর গায়ে হাত রাখা যে কত বড় অপরাধ তা তুমি জানো না। তুমি চলে যাও।

ঃ তুমি কথা দাও আমাকে ডাকবে।

নেহাল বানু বললো ঃ অসম্ভব!

ঃ অসম্ভব নয়। আমি জানি তুমিও আমাকে চাও। তোমাকে সুখী করবার ক্ষমতা সৈয়দ জামালের নেই। আমাকে শুধু শুধু কেন অস্বীকার করছো!

কাছে কোথাও জসিমের গলার স্বর শোনা গেল। নিজেকে আমার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলো নেহাল বানু। এক রকম দৌড়ে পালিয়ে গেল বারান্দা ধরে শেডের নিচে। ভয়ে তার চোখ-মুখ নীল হয়ে উঠেছে। একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

মৃদু হাসলাম আমি। ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম না। যা পাওয়ার তা আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। আবিষ্কার করে ফেলেছি সৈয়দ জামালের হৃদয়ের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা।

হ্যাঁ। নেহাল বানুকে নষ্ট করবো আমি। এই কাহিনী যথাসময়ে সৈয়দ জামালকে জানাবো সবিস্তারে। আইরিনের খুনের প্রতিশোধ শুধুমাত্র এভাবেই নেয়া চলে।

আমি জানি নেহাল বানুকে নষ্ট করতে পারলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সৈয়দ জামালের হৃদয়। যন্ত্রণায় নরক হয়ে উঠবে ওর

জীবন। হতাশায় ভেঙে যাবে মন।

খোদার কসম, ওর বুকে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেয়ার আগে এই কষ্ট, এই যন্ত্রণাই জাগিয়ে তুলতে চাই আমি!

বারো

বেরোলাম। নদীর ধারে একটা কাবাবের দোকান আছে। সেখানে হাসান আলী আমার জন্য অপেক্ষা করবে কথা ছিল, তাই সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম হাসান আলী নয়, কাউন্টারের ঠিক পেছনের টেবিলেই বসে আছে দারোগা বোরহান আহমেদ।

আমার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল।

আমি যে কোনো বিপদের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছি। সুতরাং আমাকে একটুও অপ্রতিভ মনে হলো না। লোকটাকে এড়িয়ে সামনের টেবিলে গিয়ে বসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোরহান আহমেদ সেই অসহ্য মিষ্টি হাসি হেসে আমাকে ডাকলো। বললো : আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খেতে আপত্তি আছে?

: কিছুমাত্র না।

বললাম : কিন্তু সকাল থেকে এখনও আমার পেটে কিছু পড়েনি। আমি নাস্তা করবো চা খাওয়ার আগে।

: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

বোরহান আহমেদ বেয়ারাকে ডেকে কিছু খাবারের অর্ডার

দিল। ওর মুখোমুখি বসলাম। স্পষ্টভাবে তাকালাম ওর দিকে। হঠাৎ ওর এই সহৃদয় ব্যবহারের কি উদ্দেশ্য আমার জানা দরকার।

বোরহান আহমেদ বললো : এখানে এসে আপনার স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে। বেশ তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছেন আপনি...

: অর্থাৎ এই শহরে এসে সাবালক হয়েছি বলতে চান ?

মৃদু হাসলো বোরহান আহমেদ। বললো : বলতে চাই, আপনি যে বেশ দিব্যি আছেন সেটা বাইরে থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

: নাকি ?

দু'জনই আমরা এরপর কিছুক্ষণ চুপকরে রইলাম। কাবাবের দোকানে বসে আছে ক'জন কাবুলীওয়ালা। হল্লা করছে নিজেদের মধ্যে। পেছনে মস্ত চুল্লির উপর কাবাব তৈরি হচ্ছে। ধোঁয়া আর কাঁচা মাংসের গন্ধে বাতাস ভরপুর। সামনের তোলা স্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে ভুবন নদীর উঁচু পাড় ও অরণ্য দেখা যায়।

বেয়ারা এসে ঝলসানো কাবাব আর রুটি দিয়ে গেল। সাথে ভুনা কিছু লিভারের মাংস।

বোরহান আহমেদ বললো : নিন শুরু করুন। আমি খেয়েদেয়ে একেবারে তৈরি হয়ে আছি।

খেতে খেতে বললাম : অর্থাৎ আগে থেকেই জানতেন আমি

এখানে আসবো ? অপেক্ষা করছিলেন ?

ঠিক তাই। আমার লোকজন খবর দিয়েছে যে একজন দাগী আসামী এই শহরের কোথাও আস্তানা গেড়েছে। তার কাজকর্ম নাকি রহস্যময় হয়ে উঠছে দিন দিন।

ঃ খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন সৈয়দনগর থেকে এ্যাদ্দুর ?

ঃ হ্যাঁ। সৈয়দনগরের আওতায় হলে আমি নিজে কখনও এভাবে আসতাম না। দু'জন পুলিশ আর একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা পাঠিয়ে দিতাম। তাতেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু এটা হলো যাকে বলে অন্য এলাকা। সুতরাং ব্যাপারটা কি জানার জন্যে আমাকেই ছুটে আসতে হলো।

বললাম ঃ অর্থাৎ শান্তি রক্ষায় উৎসাহ আপনার এমন যে একজন দাগী আসামী আস্তানা গেড়েছে অন্য এলাকায় শুনে স্থির থাকতে পারেননি,—ছুটে এসেছেন ?

হাসলো বোরহান আহমেদ। নির্লজ্জ হাসি। ক্ষমতা জাহিরের গর্ব। বললো ঃ মনে করুন তাই।

ঃ আমি এখানে আসবো কে বলেছে আপনাকে ?

ঃ সেটা জেনে আপনার কি লাভ মিঃ মাহমুদ ? তারচেয়ে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

একটু হেসে বললো ঃ উত্তর দেয়া না দেয়া আপনার ইচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন অন্য এলাকায় থাকলেও আমার ক্ষমতা এখানেও কিছু কম নয়। ইচ্ছে করলেই আপনাকে জব্দ করা আমার

পক্ষে সম্ভব।

বললাম ঃ তা আমি জানি। এখন আপনার প্রশ্নগুলো বলুন।

ঃ এই শহরে কি করছেন আপনি ?

ঃ চাকরি খুঁজছি।

ঃ চাকরি ! পেয়েছেন ?

ঃ না। দেবেন নাকি একটা চাকরি ?

বোরহান আহমেদ আমার ঠাট্টা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো স্থির আত্মবিশ্বাসের ছাপ। সুশ্রী চেহারায় ঝক্ ঝক্ করছে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা।

বললো ঃ চাকরি হয়তো আপনাকে দিতে পারবো না। কিন্তু বন্ধুভাবে যদি কোনো ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই, বিশ্বাস করবেন আমাকে ?

কথাটা বুঝিয়ে বলুন স্যার। আপনার কথা শুনে ঘাবড়ে যাচ্ছি। এরকম সুন্দর সৎ কথা এককালে কলেজের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেছি ! সৈয়দ জামালের সহকারী দারোগা বোরহান আহমেদের স্বভাবের সাথে কথাগুলো ঠিক মানায় না !

বোরহান আহমেদের চোখে-মুখে গাম্ভীর্য ভারি হয়ে ফুটলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো ঃ আমার স্বভাবের এমন কি আপনি দেখেছেন যে আমার পক্ষে ভাল কথা বলা, ভাল কাজ করা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে আপনার ?

বললাম ঃ অতীতকে ভুলে যাবেন না মিঃ বোরহান ! মাম-

লায় আপনার সাক্ষ্যেই, বলা যাক মিথ্যা সাক্ষ্যেই, আমার জেল আর জরিমানা হয়েছিল।

ঃ হ্যাঁ হয়েছিল।

বোরহান আহমেদ ঠাণ্ডা গলায় বললো ঃ কিন্তু আমি আবার বলছি অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভাল। আমার পক্ষেও, আপনার পক্ষেও। আমি মহাপুরুষ নই সেটা ঠিক। কোনো মানুষই মহাপুরুষ হয় না সব ক্ষেত্রে। কিন্তু নিজেকে সংশোধন করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। একটা খারাপ কাজ করেছিলাম বলেই একটা ভাল কাজ করতে পারবো না এটা বলা অন্যায়।

তা তো বটেই। কিন্তু জানতে পারি হঠাৎ আমার ভাল করার জন্যে কেন এভাবে উঠে পড়ে লাগলেন?

ঃ যদি বলি আপনার ভাল হোক, আপনি আবার সুস্থ মানুষের মতো জীবন-যাপন করতে শুরু করেন এটাই আন্তরিকভাবে চাই আমি?

ঃ মিথ্যে সাক্ষ্যের জন্যে আপনি অনুতপ্ত?

ঃ না।

বোরহান আহমেদের চোখ-মুখ কঠোর হয়ে উঠলো। বললোঃ অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে আমি আসিনি মাহমুদ সাহেব। আমার একটা প্রস্তাব আছে।

ঃ বলুন।

ঃ আপনি তিনদিনের ভেতর শহর ছেড়ে চলে যাবেন।

ঃ বদলে ?

ঃ কিছু টাকা পাবেন আপনি।

আমি হেসে উঠলাম। বোরহান আহমেদ গ্রাহ্য করলো না আমার পরিহাস। বললো ঃ আবার যাতে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারেন আপনি, সেজন্যেই টাকাটা দেয়া হবে।

ঃ অর্থাৎ ঘুষ ?

ঃ না, ভদ্রলোকের চুক্তি।

বোরহান আহমেদ একটু হাসলো। বললো রাজি আছেন ?

ঃ না,

আমি বেশ সহজভাবে বললাম ঃ সৈয়দ জামালের টাকা আপনাকে কিনতে পারে মিঃ বোরহান কিন্তু আমার বিক্ষোভ কিছুতেই মিটবার নয়।

ঃ হুঁ।

বোরহান আহমেদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপচাপ। তারপর বলে ঃ এটা ঠিক যে সৈয়দ জামালের জীবনের নিরাপত্তার জন্যেই আপনার ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু চুক্তিটা শুধু সৈয়দ জামালের জন্যে নয়, আপনার জন্যেও মঙ্গলজনক ছিল। যাক, সে উপদেশ আর খরচ করবো না। আমার প্রস্তাবটা যখন অগ্রাহ্য করলেন তখন ভবিষ্যতেই এর ফলাফল দেখা যাবে।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিল বোরহান আহমেদ।

আমি দ্রুত চিন্তা করছিলাম। বোরহান আহমেদ কেন আমার সাথে দেখা করতে এসেছে সেটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সৈয়দ জামালের সার্বিক নিরাপত্তা! সৈয়দ জামালের জীবনের উপর যেন কোনো বিপদের আশঙ্কাই না থাকে তার ব্যবস্থা করতে চায় বোরহান আহমেদ! সৈয়দ জামালের জীবন রক্ষা করার জন্যেই সব স্মৃতি সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আমার ভাল হওয়া দরকার। শরীরের ভেতর বিষিয়ে উঠলো একটা অসহ্য ক্রোধ।

কিন্তু নিজেকে দমন করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ইতিমধ্যে আমি আয়ত্ত করে ফেলেছি। তাই নির্বিকার হয়ে বসে রইলাম।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বোরহান আহমেদ বললো: আমাদের পুলিশের আইন-কানুনই ভাল সায়েব,—লাগাই জোরসে গোত্তা···ডাণ্ডা মারি সাধ মিটিয়ে। সব ঝামেলা চুকে যায়। ভাল-মন্দ সব সমান হয়ে যায়!

কথাগুলো বলে হাসলো বোরহান আহমেদ। কৌতুকের চোখে তাকালো। বললো: খুব ঘৃণা করেন আপনি সৈয়দ জামালকে?

: করি।

: একদিন হঠাৎ আক্রমণ করে খুন করবেন সৈয়দ জামালকে?

বললাম: থানার দারোগার সাথে এরকম রসালাপ করা একজন দাগী আসামীর শোভা পায় না। তা সত্ত্বেও বলছি মিঃ

বোরহান, সৈয়দ জামালকে আমি ছাড়বো না···

বোরহান আহমেদ বললো ঃ কিন্তু সৈয়দ জামালকে আপনি যদি চিনতেন, যদি জানতেন তাহলে ওকে ক্ষমা করা আপনার পক্ষে কঠিন হতো না মিঃ মাহমুদ।

ঃ খুব বুঝি মহৎ মানুষ ?

ঃ মহৎ, উদার এবং হৃদয়বান।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম ঃ ছাড়ুন এসব কথা মিঃ বোরহান। আইনের সূত্রেই যদি জিজ্ঞেস করেন আমি এ শহরে কেন আছি, কি করছি তো এর জবাব ঃ আমি এখানে চাকরি খুঁজছি।

বোরহান আহমেদ কঠিন মুখে বললো ঃ কিন্তু আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি, যত শীঘ্র পারেন এ জায়গা ছেড়ে চলে যান। নইলে খুবই অসুবিধেয় পড়বেন।

বোরহান আহমেদ চলে যাবার পর আমার প্রথম চিন্তা হলো আমার এই দোকানে আসার খবর কে দিয়েছে বোরহান আহমেদকে ? এটা বুঝতে কষ্ট হলো না যে আমার সম্পর্কে সব খবরই জানা আছে বোরহান আহমেদের এবং তার প্রভু সৈয়দ জামালের।

অর্থাৎ সর্বদা আমার উপর নজর রাখা হচ্ছে ?

লোকটা কে ? কে আমার খবরাখবর বোরহান আহমেদকে দিচ্ছে ?

তেরো

: শেষ রাত্তের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে। অবাক হলাম।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, রাত তখনও শেষ হয়নি এ-সময় কে আবার টেলিফোনে ডাকলো ?

তন্দ্রাজড়িত পায়ে বিছানা থেকে নেমে গেলাম টেলিফোনের কাছে। রিসিভারটা তুলে নিলাম।

: হ্যালো।

: কে মাহমুদ ? চিনতে পারছো ? আমি সৈয়দ জামাল।

: কি ব্যাপার ?

: অসময়ে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি ?

সৈয়দ জামালের হাসির শব্দ শোনা গেল।

: রসিকতা রেখে যদি আসল কথাটা বলেন তো খুশি হই সৈয়দ সাহেব।

: আহা, রেগে যাচ্ছো কেন ? শোনো মাহমুদ আমি তোমার সাথে আপোসে কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। মানে বেশ জরুরী

কথা···ঢাকা থেকে ফিরেছি এই ঘন্টা দশেক আগে···হ্যালো, মাহমুদ···তোমার শরীর ভাল আছে তো···

ঃ ভাল আছে।

ঃ বেশ, বেশ,···শুনে খুশি হচ্ছি। মাহমুদ···তুমি কি আগের কথা ভুলে যেতে পারো না ভাই ? সত্যি বলছি তোমার জন্যে খুব 'ফীল' করছি···সামান্য যে একটু ভয়ও পাইনি তা নয়···

সৈয়দ জামাল দরাজ গলায় হাসলো। ক'দিন একটু দুশ্চিন্তায়ও ছিলাম বলতে পারো, তবে সেটা সামান্য। আসলে আমি তোমার জন্যে কিছু করতে চাই। তোমার ভাল কিছু করতে চাই। বিশ্বাস করছো না মাহমুদ···হ্যালো ··

ঃ নীতিকথা শুনবার জন্যেই এই শেষরাতে টেলিফোন করলেন স্যার ?

ঃ আরে না, না··· শোনো মাহমুদ আমি তোমার সাথে কিছু জরুরী ব্যাপারে কথা বলতে চাই। চলে আসো না তুমি আমার এখানে ? হ্যাঁ, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দু'জনে বসে চা খাবো আর আলোচনা করবো ? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো তো···হ্যালো মাহমুদ···

আমার বুকের ভেতর কেউ হাতুড়ি পিটছিল। আত্মবিশ্বাসের শেষ খুঁটিটাও যেন প্রচণ্ডবেগে নড়ে উঠলো।

আমি চুপ করে আছি দেখে সৈয়দ জামাল উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো ঃ হ্যালো মাহমুদ···তুমি কি তাহলে আসছো না ? আমি

যে ভাই ভেবেছিলাম আজ এক সাথে চা খেতে খেতেই সব ঝামেলা চুকিয়ে-বুকিয়ে দেবো। তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না মাহমুদ ···হ্যালো···

বললাম ঃ বিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয় সৈয়দ সাহেব। যাহোক, আপনি গাড়ি পাঠিয়ে দিন, আমি আসছি।

ঃ আমি জানতাম তুমি আসবে···সৈয়দ জামাল খুশি হয়ে বললো ঃ ঠিক আছে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি···তুমি তৈরি হয়ে নাও···

টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে মোশাররফ হোসেন। বিষণ্ন ও গম্ভীর।

কঠোর গলায় বললাম ঃ সৈয়দ জামালকে আমার টেলিফোন নম্বর, আমার কুঠুরী আর গন্তব্যস্থানের খবরাখবর কে সাপ্লাই করেছে হোসেন সাহেব ? আপনি না আপনার চেলা হাসান আলী ?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মোশাররফ হোসেন। তারপর বললো ঃ হাসান আলী। ওকে আমি কাল থেকে খুঁজছি। পাচ্ছি না।

ঃ কেন, শাস্তি দেবেন?

ব্যঙ্গ করে বললাম ঃ স্পাইগিরি করার শাস্তি দেবেন হাসান আলীকে ? এইটুকু বুদ্ধি নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন সৈয়দ জামালের সাথে লড়তে। বলিহারী আপনার বুদ্ধি।

মোশাররফ হোসেন আস্তে আস্তে বললো : হ্যাঁ, আমারই দোষ! দেড় বছর ধরে হাসান আলী আমার সাথে আছে, ওকে আমি চিনতে পারিনি! অথচ চেনা আমার উচিত ছিল। কারণ আপনার চেয়েও বেশি আগুন আমার বুকে জ্বলছে। একটা সাধারণ লোক দেড় বছর ধরে ফাঁকি দিল, আমি বুঝতে পারলাম না এ দুঃখ আমার যাবে না···

মোশাররফ হোসেনের কথায় আবার সেই রহস্য। কি আছে এই রহস্যের পেছনে? তাকালাম ওর দিকে। ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় মোশাররফ হোসেন যেন ভেঙে পড়েছে।

বললো : সৈয়দ জামালেরই চর হাসান আলী। আগেও দু'-একটা ব্যাপারে কিছু কিছু সন্দেহ হয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি আমার সন্দেহ ঠিকই ছিল···

বললাম : একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

: বলুন।

: সৈয়দ জামালের উপর কেন আপনি প্রতিশোধ নিতে চান?

: কেন?

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মোশাররফ হোসেন। বললো : সবকথা আপানাকে একদিন খুলে বলবো মাহমুদ সাহেব। বুঝতে পারবেন কেন সব ছেড়ে এই লোকটার পেছন আমি লেগেছি। এখনও সব খুলে বলার সময় আসেনি। সময় আসুক, সব বলবো।

ছু'জনই চুপ করে থাকি।

আমি বর্তমান সমস্যায় ফিরে এসে বলি : শুনুন···সৈয়দ জামাল আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছে। আমি মিনিট দশেকের ভেতর ওর বাড়ি যাচ্ছি।

: আত্মসমর্পণ করছেন ?

: না। বেআইনী প্ল্যানে 'আত্মসমর্পণ' কথাটা নেই। আমি সৈয়দ জামালের মতলব কি সেটা বুঝতে যাচ্ছি। সৈয়দ জামাল ভয়ঙ্কর লোক। আমার এখানকার কোনো কার্যকলাপই ওর অগোচরে নেই। সুতরাং ওকে underestimate করা উচিত নয়। আমি যদি ঘণ্টা ছু'য়েকের ভেতর ফিরে না আসি তাহলে···

একটু হাসলাম, তাহলে আইনের আশ্রয় নেবেন শেষবারের মতো। চলি···

ঘরে গিয়ে কাপড় পরলাম। সাথে নিলাম ইস্পাতের ভাঁজে ভাঁজে বিষ মাখানো যে ছুরি—খাঁটি জিনিস, —সেটা।

হয়তো ছুরি নিয়ে কোনোই ফল হবে না। তবু একটা সান্ত্বনা থাকলো যে প্রয়োজন হলে অন্ততঃ চেষ্টা করা যাবে বাঁচবার অথবা মরবার !

পনেরো মিনিট পর আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। কুৎসিত দেখতে একটা লোক,—সোফার, গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিল। ওর চোখে-মুখে সম্মানের, সমীহের ভাব।

গাড়িতে উঠে বসলাম।

অদূরে ক্লাবের একটা ঘরে নীল আলো জ্বলছে। অন্ধকার গাছপালার ছায়া নড়ছে। বাতাস চলে গেল শিশির আর শিউলির আঘ্রাণ নিয়ে শহর থেকে ভুবন-নদীর দিকে। দুলে উঠলো গাছপালা।

নেহাল বানুর কথা মনে পড়লো ওর। লোভাতুর, ক্ষুধার্ত চোখ দু'টি ভেসে উঠলো মানসপটে।

গাড়ি শহর ছাড়িয়ে ছুটে চললো খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে সৈয়দনগরের দিকে। পথের দু'পাশে ফসলের ক্ষেত, গ্রাম আর জঙ্গল। বাতাসে ঘাস আর খড়-কুটোর গন্ধ।

সৈয়দ জামাল মস্ত বড়ো সাজানো ড্রইংরুমের একটা ডিভানে বসেছিল, উঠে দাঁড়ালো আমাকে দেখে। হাসলো। করমর্দন করলো আন্তরিকভাবে। তাকিয়ে দেখলাম বাঁ'পাশে কৌচে বসে আছে নেহাল বানু। চোখে-মুখে অবজ্ঞা আর নিষ্ঠুরতার ছায়া।

বসলাম সৈয়দ জামালের মুখোমুখি। সৈয়দ জামালের পরনে শিকারের খাকি পোশাক। পায়ে বুট। গায়ে কর্ডের হালকা ধূসর রঙের শার্ট। গলায় ব্রাউন রঙের স্কার্ফ। পায়ের কাছে শুয়ে আছে চার-পাঁচটা পাকা শিকারী কুকুর। শুয়ে তাকাচ্ছে বড় লাল জিহ্বা বের করে।

সৈয়দ জামালের কোলের উপর শুইয়ে রাখা আছে একখানা টুয়েল্‌ভ্‌ বোর ডাব্‌ল্‌ শট-গান। গ্রীনার।

: যথাসময়ই এসেছো।

সৈয়দ জামাল আমার দিকে তাকিয়ে বললো। বেয়ারা এল এসময় বিনীতভাবে। সৈয়দ জামাল কতগুলো খাবারের নাম বললো। একটা মদের নাম বললো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো : আপত্তি নেই তো ?

একটু হাসলাম : মদে আপত্তি আছে ? বেশ, কফি খাও তাহলে। মদ আমিও খাই না, বুঝলে, সকালবেলায় কমলা-লেবুর রসের সাথে কয়েক ফোঁটা হুইস্কি মাত্র। আর রাত্রিবেলা···

হঠাৎ নেহাল বানুর স্পষ্ট গলার স্বর ভেসে উঠলো : খাবার টেবিল সাজানো হয়েছে। চলো।

তিনজনই সজাগ হয়ে উঠলাম। মনে পড়লো সেই রাত্রির কথা। হুইস্কি···অ্যাক্সিডেন্ট···আইরিন···আমার বুক কে যেন খালি করে দিল।

খাবার টেবিলে এটা-ওটা নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হলো। সৈয়দ জামাল আমার পাতে একটা চমৎকারভাবে 'গ্রিল' করা 'স্টেক' উঠিয়ে দিল, নেহাল বানু অনুরোধ করলো দু'টো বাড়তি প্রণ নেয়ার জন্যে। এটা-ওটা বলার পর একসময় আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো সৈয়দ জামাল।

: মাহমুদ, আমি যদি তোমাকে খুশি করতে চাই, সম্ভব ?

: বুঝতে পারছি না।

সৈয়দ জামাল বললো : আমার একটা কুকুর একবার খাবার

না দেয়ার আমাকে কামড়াতে এসেছিল। দু'টুকরো বেশি মাংস দেয়ার পর কুকুরটা খুশি হয়ে লেজ নেড়েছিল কৃতজ্ঞতায়।

: অর্থাৎ আমাকে কৃতজ্ঞ করতে চান ?

: হ্যাঁ।

: চাকরি দিতে চান ?

: চাই। আমার ফার্মে তোমাকে দেয়ার মতো অনেক দামী চাকরি আছে। যে কোনো একটা বেছে নেবার সুযোগ দেয়া হবে তোমাকে।

: কথা ঠিক থাকবে আপনার ?

: বাজে বকো না মাহমুদ।

সৈয়দ জামাল ছোটখাটো গর্জন ছাড়লো : এই এলাকায় সবাই জানে আমি কখনও কথা ফিরিয়ে নিই না। কোনো কারণেই না।

: বেশ করবো চাকরি আপনার ফার্মে। ট্রাক-ড্রাইভারের একটা চাকরি দিন আমাকে। কি, হা হয়ে গেলেন যে স্যার ? হ্যাঁ···এই চাকরিটাই চাই আমার। কেন ? ভাল ভাল চাকরির অফার ছেড়ে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরিটা কেন নিতে চাচ্ছি ? মনে করুন ইচ্ছে, আমার ইচ্ছে।

: তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে মাহমুদ।

বিরক্ত হয়ে বললো সৈয়দ জামাল : ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি ···আশ্চর্য···অভিমান তোমার এখনও যায়নি ? হ্যাঁ···? বললাম

তো ভাই রাগ-টাগ সব ছেড়ে বন্ধুর মতো হাত মেলাও। দিল্ সাফ করো মিঞা···তাহলে নারায়নগঞ্জ ফার্মে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্টে তোমাকে নিয়োগপত্র দিয়ে দিতে বলি হেড-অফিসে, কেমন ?

বললাম ঃ না। চাকরি ঐ একটাই আমি করতে পারি। ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি। আর সেটা এই সৈয়দনগরে, আর কোথাও না। সৈয়দনগরের রাস্তায় আমি ট্রাক চালাবো। ভদ্রলোকের জীবন আমার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

আমার কথাগুলো সৈয়দ জামালের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করলো না। লোকটা তেমনি, সত্যিকার ভাল মানুষের মতো আমার কথা শুনে বিস্ময়ে হা হয়ে রইলো। পরে মজা পেয়ে খুব হাসতে লাগলো। কিন্তু নেহাল বানু হাসলো না। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো চাপা কৌতূহল। মনে হলো আমার সব অভি-সন্ধি যেন ওর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

সৈয়দ জামাল হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলো। বললো ঃ বেশ, ···আমার কোনো আপত্তি নেই। মোট কথা হলো, আজ থেকে সব ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল আমাদের, কেমন ?

দু'চোখে কোমল হাসি আর ঔদার্য নিয়ে লোকটা তাকালো আমার দিকে। মুহূর্তে কেমন জানি খটকা লাগলো আমার। এই লোকটাই কি আইরিনকে হত্যা করেছিল গাড়ি চাপা দিয়ে ? মিথ্যে মামলা সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল আমাকে ? আশ্চর্য !

সৈয়দ জামাল বললো : সারা তল্লাট খুঁজে দ্যাখো···আমার শত্রু খুঁজে পাবে না। ওসব রেষারেষি আমি পছন্দ করি না। সম্ভব হলেই মিটিয়ে ফেলি। না, না···গুণ-টুনের ব্যাপার না ওটা।

সৈয়দ জামাল হাসলো, আশ্বাস দিল : আমার কাছ থেকে তোমার আর কোনো ভয় নেই মাহমুদ। আগের কথা ভুলে যাও। অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। এখন থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু।

সে উঠে দাঁড়ালো। ঘড়ি দেখে বললো : তুমি ধীরেসুস্থে কফি খাও। আমি ততক্ষণ কুকুর ক'টা নিয়ে একটু ঘুরে আসি। হ্যাঁ, এসময়টা আমি বাইরে খানিক দৌড়োই, বনে-বাদাড়ে সুযোগমত দু'একটা পাখি শিকারও করে থাকি।

সৈয়দ জামাল হাসলো। হাতে শট-গান। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কুকুরগুলো উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। লেজ নাড়ছে।

কুকুরগুলো নিয়ে সৈয়দ জামাল প্রাঙ্গণ পার হয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল। আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে এতক্ষণে।

ঘরে আমি ও নেহাল বানু বসে আছি। হাসলাম আমি। বললাম : সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা মুহূর্ত আমি নষ্ট করতে চাই না।

নেহাল বানু বললো : মানে ?

দরজার পর্দাটা টেনে দিলাম। ভীত হয়ে উঠলো নেহাল বানু। ঘর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করলো সে সচকিত হয়ে। তার আগেই আমি এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম ওকে। ওর দু'জোড়া ঠোঁট শক্ত ও শীতল হয়ে আছে। বানবিদ্ধ পাখির মতো নেহাল বানু ছটফট করতে লাগলো আমার দৃঢ় আলিঙ্গনে।

: পাগলামি করো না···প্লিজ, ছাড়ো···

ততক্ষণে আমার মুখ নিচু হয়ে এসেছে। নেহাল বানুর ঠোঁট দু'টি ভয়ে আশঙ্কায় শীতল ও অবসন্ন। আমার উন্মত্ত চুম্বনে ও অধীর হয়ে উঠলো। প্রথমে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে শরীর এলিয়ে এল ওর। ঠোঁট জোড়া জীবন্ত হয়ে উঠলো। ওর উষ্ণ জিহ্বা জীবনময় হয়ে উঠলো আমার মুখে।

তারপরই এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। সরে গেল দূরে। চোখ-মুখ আরক্তিম। অনেকটা কৌতুকের হাসি হেসে বললো : তোমার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই মাহমুদ। সৈয়দ জামালের স্ত্রীকে স্পর্শ করা কতখানি অপরাধ তা তোমার জানা উচিত ছিল।

: জানি। জেনেই আমি এগিয়ে এসেছি, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না বানু।

ঠিক এসময় জসিম ঘরে ঢুকলো। একবার তাকালো নেহাল বানুর দিকে। তারপর আমার দিকে। গম্ভীর গলায় বললো : আপনার জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে সোফার।

: আমি এক্ষুনি আসছি।

জসিম দাঁড়িয়েই রইলো। নেহাল বানু বললো : আপনি যান।

: যাচ্ছি। আপনাদের দু'জনকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জীবনের সবচেয়ে ভাল ব্রেকফাস্ট করেছি আজ।

হাসলো নেহাল বানু। বললো : কৃতজ্ঞ ?

: হ্যাঁ।

ঘরে ফিরে এসে বিচিত্র এক তৃপ্তিতে ভরে উঠলো মন। নতুন খেলায় জড়িয়ে পড়েছি। সৈয়দ জামাল হারতে শুরু করেছে এখন থেকে।

কিন্তু কতগুলো প্রশ্ন অধীর করে তুললো আমাকে। বোরহান আহমেদ কেন এসেছিল গতকাল রেস্টুরেন্টে ? হাসান আলী কার লোক ? সৈয়দ জামাল সব জেনেশুনেও কেন তার ফার্মে চাকরি দিচ্ছে আমাকে এভাবে ?

মোশাররফ হোসেন ঘরে ঢুকলো এসময়। বললো : কখন ফিরেছেন ?

: এই তো।

: কি ব্যাপার ? সৈয়দ জামাল হঠাৎ ডেকেছিল কেন আপনাকে ?

সব কথা ওকে খুলে বললাম। চাকরি নিতে যাচ্ছি শুনে

গম্ভীর হয়ে উঠলো মোশাররফ হোসেন। বললো : আমার কি মনে হয় জানেন ?

: কি ?

: সবটা ব্যাপারই অন্যরকম।

: মানে ?

: মানে সবটা ব্যাপারের পেছনে একটা রহস্য আছে।

: হঠাৎ একথা মনে হওয়ার কারণ ?

দুর্বোধ্য হাসি হাসলো মোশাররফ হোসেন। বললো : কারণ আছে বলেই বলছি ? সব কথা খুলে বলা এখন সম্ভব নয় মাহমুদ সাহেব। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ পেয়ে যায় না মানুষ ? সৈয়দ জামালের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়েও আমি ঠিক তেমনি কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার জেনে গেছি। যথাসময় আপনাকে সেটা বলবো। এখন শুধু জেনে রাখুন আমি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি এবং দু'চার দিনের মধ্যেই সবাইকে অবাক করে দেবো আমার তদন্তের ফলাফল জানিয়ে।

: লেট আস্ হোপ ফরদা বেস্ট।

আমি হাসলাম : আমি কিন্তু সৈয়দ জামালের জন্যেই অপেক্ষা করছি। কাল থেকে আমি ট্রাক চালাবো সৈয়দ জামালের এবং আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে সৈয়দ-নগরে।

চোদ্দ

: আমার নাম মাহমুদ।

আমি হেড-অফিসের ছোট সাহেবের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করলাম।

: জানি।

লোকটা লাল চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। বললো : ক'দিন আগে অল্পের জন্যে আমার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলে তুমি। কি মনে পড়ে না ?

বললাম : না। আমার ব্যাপারে বড়কর্তার কোনো নির্দেশ আছে কিনা সেইটে জানতে এসেছি।

লোকটা হাসলো। বললো : আছে বৈকি। এই যে তোমার নিয়োগপত্র। আগের কথা তুললাম বলে কিছু মনে করো না যেন। হ্যাঁ, নিয়োগপত্র নিয়ে তোমাকে এখন রিপোর্ট করতে হবে পারসোন্যাল অফিসারের কাছে। কবে কাজে জয়েন করতে চাও ?

: আজই।

: বেশ, আমি এখুনি গ্যারেজে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লোকটা মিটমিট করে তাকালো আমার দিকে। লম্বা গলা। উঁচু কপালের নিচে গর্তে-বসানো চোখ। চোখ দু'টি লাল আর ভাবলেশহীন।

: কর্তার সাথে বুঝি আবার খাতির হয়ে গেছে ? বেশ বেশ ···আমাদের সাহেব হলেন কেরেশতা। কারও অপরাধ তিনি কখনও মনে রাখেন না। তা ড্রাইভার সায়েবের থাকা হবে কোথায় ?

আমি ওর কথায় জবাব দিলাম না। বললাম : আমাকে তাহলে পারসোন্যাল অফিসারের কাছে গিয়ে এখন রিপোর্ট করতে হবে ?

ছোট সায়েব লোকটা আলাপী। আলাপে কান দিলাম না দেখে সে অতিশয় বিরক্ত হলো। বললো : নিয়ম ধরো গে তোমার-তাই। তা তোমার চাকরি বাপু আমিও ইচ্ছে করলে নট করে দিতে পারি। আমার সাথেও ভাব-সাব রাখার চেষ্টা করো বুঝলে ?

: করবো। একটা কথা···

: বলো।

: ভবিষ্যতে সম্বোধন করার সময় আপনি বলবেন। তা নইলে···

: নইলে ?

: চড়িয়ে সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো।

: ব্যস, ব্যস···

ছোট সায়েব আর্তনাদ করে উঠলো : আর বলতে হবে না। কি ভয়ংকর লোকই যে অফিসে ঢুকেছে তা প্রথম দিনেই টের পাচ্ছি। তুমি···আপনি এখন যান। দয়া করে যান!

পারসোন্যাল অফিসার চুপচাপ মানুষ। বড়ো সায়েবের ঠিক বিপরীত। আমাকে কতগুলো রেজিস্ট্রি খাতায় সই করতে হলো। একটা খাতায় টিপসই দিতে হলো। নিয়োগপত্রের ঝামেলা চুকে যাবার পর পারসোন্যাল অফিসার বললো : আপনি আজই কাজে জয়েন করছেন?

: জী।

: আপনার নামে বড়কর্তার একটা নির্দেশ আছে। চিঠি।

বুঝলাম ছোট সায়েবের কাজ! প্রথম দিনেই কাজে জয়েন না করতেই কমপ্লেন। খামটা খুলে চিঠিখানা বার করলাম। সৈয়দ জামালের হাতের লেখা : গ্যারেজে যাবার আগে আমার সাথে দেখা করো। জরুরী।

দোতালায় উঠে গেলাম। ভারি পর্দা ঝুলছে সৈয়দ জামালের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ঘরের দরজায়। যুবতী সেক্রেটারী যথা-বিহিত খবর নিল এবং আমাকে সৈয়দ জামালের ঘরে যাবার অনুমতি দিল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল সৈয়দ জামাল। হাতের আঙুলে

পুড়ছে সুগন্ধি সিগারেট। গম্ভীর চোখ-মুখ।

আমাকে দেখে ভূমিকা ছাড়াই বললো : তুমি জয়েন করছো ?

: জয়েন করে ফেলেছি।

: কিন্তু আমার ফার্মে কাজ করা ঠিক হবে কিনা সেটা কি ভালভাবে ভেবেছো ?

বললাম : হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

: কারণ আছে। খবর পেলাম তুমি গতকাল সকাল বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে মোটেও শালীন ব্যবহার করোনি।

: হ্যাঁ, করিনি···

: এর অর্থ কি জানো ইডিয়েট ?

সৈয়দ জামাল গর্জন করে দু'পা এগিয়ে এল। ভয়াবহ চেহারা ফুটে উঠেছে তার। বললো : এ রকম ধৃষ্টতা আমি কখনও সহ্য করি না। দরকার হলে এজন্যে তোমাকে খুন করতে পারি এটা জানো ?

: হ্যাঁ।

: মনে রেখো সৈয়দনগরে যা কিছু ঘটেছে সবই আমার জন্যে। চালাকি করার কোনো চেষ্টা করো না আমার সাথে। মারা পড়বে।

: শুনে রাখলাম। এখন যেতে পারি ?

: পারো। শেষ কথা শুনে যাও। আর কখনও, কোনো কারণেই আমার বাড়িতে তোমার যাওয়া চলবে না। বুঝেছো ?

বললাম : যা ঘটবেই তার উপর কারও হাত নেই স্যার। ঠিক আছে, আপনার কথাগুলো আমার মনে থাকবে।

সৈয়দ জামালের ঘর থেকে বেরিয়ে গ্যারেজে এলাম। ভুবন-নদীর একটা বাঁকে খোলামেলা মাঠের ধারে প্রকাণ্ড গ্যারেজটা প্রায় দু'শো ট্রাক রাখা চলে এখানে। গ্যারেজের লোকজন সবাই বিচিত্র ভঙ্গিতে গ্রহণ করলো আমাকে। সবাই বুঝলো পাশার দান উল্টে গেছে, আবার নেক-নজরে পড়েছি আমি সৈয়দ জামালের। কিছুদিন আগের ঘটনার কথা কেউ তুললো না। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখলো, কেউ অবাক হলো। কেউ মজা পেল। কেউ ঠাট্টা করে হাসলো। কিন্তু আমাকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস পেল না।

গ্যারেজ ইনচার্জ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করলো। আমাকে গাড়ি চালাবার প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন দিতে হলো ওর কাছে। লোকটা মন্তব্য করলো আমার হাত যথেষ্ট ভাল। তবে অনভ্যাসের ত্রুটি আছে। আশ্বাস দিল কিছুদিন ইন্টেরিয়ারে [অর্থাৎ সৈয়দনগরে ও আশপাশে] গাড়ি চালাবার সুযোগ পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আদেশ হলো মাস দুই হালকা কাজকর্ম দিতে হবে এবং পরে ভারি এবং দূরের কাজ।

যথারীতি কাজ করতে লেগে গেলাম। মহকুমা শহর থেকে সৈয়দনগরের দূরত্ব দশমাইল। বাসে যাওয়া-আসা করি। মাঝে

মাঝে গ্যারেজের কোনো গাড়ির লিফ্‌ট পেয়ে যাই। কাজটা মন্দ লাগছে না। যে মাহমুদ ঢাকার এক বিশিষ্ট সওদাগরী অফিসে হিসাব রক্ষকের কাজ করতো, সে মরে গেছে। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে এক হত্যাকারীর প্রাণ। যার কিছু হারাবার নেই তার ভয় কি?

আমি নীরবে, একটুও অধীর না হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সুযোগের।

একদিন দুপুর বেলা অফিসে দেখা হয়ে গেল বোরহান আহমেদের সাথে। আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল। বললো: কি হে ড্রাইভার, কাজকর্ম কেমন লাগছে?

: বেশ ভাল।

: মতলবটা কি এখনও আছে, না মাথা এখন পরিষ্কার?

বললাম: প্রসঙ্গটা out of track হয়ে গেল মিঃ বোরহান। মনে রাখবেন যে-সাপের বিষ আছে তাকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। ভদ্রলোকের চুক্তির কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: আপনি সংযত থাকুন। আমাকে সংযত থাকার সুযোগ দিন।

: বাঃ চমৎকার। ইচ্ছে করছে পাছায় একটা লাথ বসিয়ে দি!

হাসতে হাসতে বললো বোরহান আহমেদ। কিন্তু আর কিছু বললো না। চলে গেল।

অফিসে হাজিরা দিতে গিয়ে সচরাচর বোরহান আহমেদের সাথে দেখা হয় না। সৈয়দ জামালের সাথে হয়। সৈয়দ জামাল

সুযোগ পেলেই অফিসময় ঘুরে বেড়ায়। আমার মনে হলো লোকটা তার ধন-দৌলত, প্রাচুর্য সব যেন সচেতনভাবে উপলব্ধি করছে প্রতি-মুহূর্তে। উপভোগ করছে কর্মচারীদের উপর তার প্রভুত্ব। সৈয়দনগরের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আমাকে দেখলে আজকাল আর ততো গম্ভীর হয় না সে। তাকিয়ে দেখে। কখনও শুকনো গলায় বলে : কেমন আছো মাহমুদ।

আমি বলি : ভাল আছি।

সৈয়দ জামাল এর বেশি কথা বাড়ায় না। আমিও না।

একদিন দুপুর বেলা অফিসের করিডর ধরে যাচ্ছি। বাঁ-দিকে সৈয়দ জামালের খাস কামরা।

যেতে যেতে একটা ভারি গলার আওয়াজ পেলাম। সৈয়দ জামালের গলা। শুনলাম সৈয়দ জামাল বলছে : ওসব আমি সহ্য করবো না, বুঝলে? বোরহানকে সাবধান করে দিও ভবিষ্যতে এরকম যেন না হয়।

কান পাতলাম সতর্কভাবে। সৈয়দ জামাল তখনও উত্তেজিতভাবে বলছে : সহ্যের একটা সীমা আছে আশুবাবু। সৈয়দ জামাল কারও পরোয়া করে না।

আশুবাবু বললো : বোরহান সাহেবকে বলবো।

: হ্যাঁ বলবে। বলবে টাকা দেবার ক্ষমতা আছে বলেই আমি টাকা দেবো না। কাকে আমি টাকা দেবো? কেন দেবো? হোয়াই? বোরহান আহমেদ কে? তাকে আমি ভয় করি?

জানো ওর আসল পরিচয়? ও হচ্ছে···

চমকে উঠলাম। বোরহান আহমেদের গলার আওয়াজ। ওকে বলতে শুনলাম: বোরহান আহমেদের একমাত্র পরিচয় সে সৈয়দনগর থানার দারোগা আর জনাব সৈয়দ জামালের এক-জন বন্ধু। অবশ্য···

শুনলাম বোরহান আহমেদ হাসছে। বলছে: অবশ্য বোরহান আহমেদের বন্ধুত্ব সৈয়দ সাহেবের হয়তো প্রয়োজনই নেই? তা হবে। সৈয়দ সাহেব হলেন শেঠ লোক, টাকার মালিক? বোর-হান আহমেদের মতো একটা সাধারণ লোকের বন্ধুত্বে তার কিই বা প্রয়োজন!

বুঝলাম আশুবাবুর সাথে নিভৃত কক্ষে যখন কথা হচ্ছিলো সৈয়দ জামালের তখন বোরহান আহমেদ ঘরে ঢুকেছে। অর্থাৎ যে কোনো বিষয়েই হোক একটা গোপন সংঘর্ষ আছে দু'জনের ভেতর।

ঘরে কিছুক্ষণ নীরবতা। বোরহান আহমেদ বললো: কিন্তু এভাবে অসাক্ষাতে কারও নিন্দে করা কি উচিত সৈয়দ সাহেব? বোম্বের কামরান যদি জেনে যায় তো কি ফল হবে, এ্যাঁ?

অস্ফুট আর্তনাদ শুনলাম সৈয়দ জামালের। বলতে শুনলাম: এরকম আর ভবিষ্যতে হবে না বোরহান। আশুবাবু, আপনি টাকাটা দিয়ে দিন। বোরহান আমার বন্ধু। ওর আপদ-বিপদ আমার দেখা উচিত।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু করিডর ধরে আসতে দেখলাম ছোট সাহেবকে। সুতরাং সরে পড়লাম।

বুঝলাম একটা কোনো গোলমাল আছে সৈয়দ জামাল ও বোরহান আহমেদের মধ্যে। হয়তো এককালে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, এখন সেটা ব্ল্যাক-মেলিং-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক বোরহান আহমেদের পজিশনটা ভাল আর সৈয়দ জামাল, বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও, তাকে ভয় করে।

পনেরো

চাকরির দু'মাস চলে গেছে। এর ভেতর একবারও নেহাল বানুর সাথে দেখা হয়নি।

একদিন বিকেল বেলা খালি ট্রাক নিয়ে গ্যারেজে ফিরছি, ওভার-ব্রিজের কাছে এসে দু'শ গজ দূরে চোখে পড়লো গাড়িটা। একটা হাল্‌কা নীল রঙের ফোক্সওয়াগেন। ড্রাইভ করছে নেহাল বানু। গাড়ির ভেতরে আর কেউ নেই।

স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। নির্জন রাস্তা। দু'ধারে জঙ্গল। সামনে হাইওয়ে।

আমার মতলব বুঝতে পেরে নেহাল বানুও স্পীড বাড়িয়ে দিল গার্ড়ির। কিন্তু যথেষ্ট সময় না থাকায় হাইওয়ের কাছে এসে সাইড নিতে হলো ওকে। আমি ততক্ষণে তাকে প্রায় ওভারটেক করে ফেলেছি।

বিপদ বুঝতে পেরে গাড়ি সাইড করলো নেহাল বানু। ব্রেক চাপলো। ততক্ষণে আমিও রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে এসেছি বাইরে।

হতবাক নেহাল বানুকে কোনো কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই আমি ওর গাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নেহাল বানু ততক্ষণে বুঝতে পেরে গাড়ির গিয়্যার দিতে গেল। আমি কাচ নামানো জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর কব্জি চেপে ধরলাম একহাতে, অন্য হাতে দরজা খুলে ওরই সিটে উঠে বসলাম।

আমার শক্ত হাতের চাপে শিথিল হয়ে এল ওর হাত। যন্ত্রণায় মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো নেহাল বানু। আমি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম ওর গাড়ির। ওকে পাশের সিটে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসলাম ড্রাইভিং সিটে পুরোপুরি।

ঃ ইতরেমি করছো কেন ওরকম ?

নেহাল বানু রাগে গালাগালি করে উঠলো। বললো ঃ আমাকে ওরকম অপমান করার অর্থ ?

ওর কথার জবাব না দিয়ে আমি বললাম ঃ আপাততঃ তোমার সবকিছু আমার উপর নির্ভর করছে নেহাল বানু। তোমাকে আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জানো ?

ঃ কোথায় ?

ঃ হাইওয়ে ডিঙোলেই যে জঙ্গলটা পড়ে, সেখানে। জায়গাটা খুবই খারাপ। চেঁচালেও কেউ শুনবে না। আর শুনলেই বা কি ? সাগরে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার ? সৈয়দনগরে আমি মরতে এসেছি। সুতরাং যত বিপদের ভয়ই থাক আমি

পরোয়া করি না···

প্রথমে ভয়ে ভাবনায় অবাক অধীর হয়ে তাকিয়ে রইলো নেহাল বানু। আস্তে আস্তে সহজ হলো সে। চারদিকে তাকালো। বিকেল পড়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে। নির্জন। থমথম করছে চারদিক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নেহাল বানু বললো: এভাবে তুমি কেন মরতে চাও মাহমুদ ?

: আমি বাঁচতেই চাই নেহাল বানু। বাঁচতে হলে তোমাকে চাই।

নেহাল বানু বললো: পাগলামি করো না। কথা শোনো। সৈয়দ জামাল তোমাকে খুন করার প্ল্যান আঁটছে। যত তাড়াতাড়ি পারো সৈয়দনগর থেকে পালাও তুমি।

: আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই নেহাল বানু। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। আমি জানতে চাই আমার সাথে তুমি আসছো কিনা।

: কোথায় ?

: আপাততঃ এই জঙ্গল ধরে কিছুদুর। নির্জন জায়গা একটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো···

আমি হাসলাম। একটা হাত রাখলাম নেহাল বানুর কোলের উপর। বললাম: তারপরের কথা নিশ্চয় তোমাকে বলে দিতে হবে না। পাকা মেয়ে তুমি, একজন প্রেমিক পুরুষ একজন যুব-

তীকে নির্জনে পেলে কি করে তা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার ?

নেহাল বানুর সারা শরীরে কেঁপে উঠলো সেই যন্ত্রণা ও ভয়। আমার হাত ততক্ষণে আরও সাহসী হয়ে উঠেছে ওর ভরা কোলের কাছে। আমার হাতটা দু'হাতে চেপে ধরলো নেহাল বানু। সরে যাবার চেষ্টা করে বললো : ইতরেমি করো না মাহমুদ। তোমাকে শেষবারের মতো ওয়ার্নিং দিচ্ছি···

অক্লেশে বললাম : একজন প্রেমিক পুরুষের উন্মত্ত ভালবাসার কথা চিন্তা করো নেহাল বানু। ভেবে দেখো বুড়ো সৈয়দ জামাল তোমাকে যা দিতে পারে না তা দেয়ার শক্তি আমার আছে।

সাদা হয়ে গেল নেহাল বানুর মুখ। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করলো। বললো : প্লিজ, যেতে দাও আমাকে। মাহমুদ, প্লিজ···

আমি দু'হাতে বেষ্টন করে ওকে টেনে আনলাম কাছে। একান্ত ঘনিষ্ঠতায়। উষ্ণ চুম্বনে তলিয়ে দিলাম ওর সব বিদ্রোহ। সব প্রতিবাদ। ভয় ও আশঙ্কা। দীর্ঘ চুম্বনে হাঁপিয়ে উঠলো নেহাল বানু। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো প্রথমে প্রাণপণে। তারপর নতুনভাবে অনুভব করলাম ওকে নতুন আবেগে। পরিবর্তিত চরিত্রে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর জিহ্বা সজীব হয়ে উঠলো আমার মুখে। নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠলো। হাত দু'টি সাপের মতো জড়িয়ে ধরলো আমার কোমর।

বুঝলাম এতক্ষণে কামনা তপ্ত হয়ে উঠেছে নেহাল বানু। চুম্বন থেকে মুক্ত করতেই নেহাল বানুর অবশ শরীরটা এলিয়ে পড়লো সিটে। চোখ বুজলো নেহাল বানু।

সেই মুহূর্তে আইরিনের স্মৃতি তোলপাড় করছিল বুকে। হ্যাঁ, এভাবেই আইরিনের মৃত্যুর শোধ নিতে চলেছি আমি। নষ্ট করতে চলেছি সৈয়দ জামালের যুবতী স্ত্রী নেহাল বানুকে। যা আমাকে অবাস্তব আর অবিবেচক করে দিল এই নির্জন সন্ধ্যায় তার নাম প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, ঘৃণা। বিশাল, প্রচণ্ড ঘৃণা।

আমি সরে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

নেহাল বানু বললো ঃ না। আজ নয়। আমি তোমাকে ডাকবো। কথা দিচ্ছি ডাকবো।

ঃ আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। ভাবছো, তোমার চালাকি বোঝার বুদ্ধি আমার নেই ?

ঃ চালাকি ?

ঃ নিশ্চয়ই। এবারকার মতো বেঁচে গেলে সৈয়দ জামালকে দিয়ে আমাকে শায়েস্তা করার সুযোগটা কি তুমি ছাড়বে ? নেহাল বানু হাসলো, বললো ঃ এরকম কোনো ইচ্ছে থাকলে সে ইচ্ছে আমি সব সময়ই পূরণ করতে পারি, মাহমুদ। তা আমি করবো না। কথা দিচ্ছি তোমাকে আমি ডাকবো।

ঃ আজকের কোনো কথা তুমি সৈয়দ জামলকে বলতে যাচ্ছো।

: মাই গুডনেস,

অবাক হয় নেহাল বানু : এ প্রশ্ন ওঠে কি করে ?

দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমার ফোন নম্বর দিয়ে বললাম : মনে রেখো আমি অপেক্ষা করে থাকবো।

হাসলো নেহাল বানু।

ট্রাক গ্যারেজে রেখে ফিরে এলাম শহরে, আমার ঘরে। চমকে উঠলাম সাপ দেখার মতো।

মোশাররফ হোসেনের মুখোমুখি তার চেম্বারে বসে আছে সৈয়দ জামাল।

আমার উপস্থিতি ওরা টের পায়নি। দাঁড়ালাম গিয়ে চেম্বারের দরজা ধরে পর্দার আড়ালে। কান পাতলাম।

সৈয়দ জামাল বললো : তুই আমার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা কর খোকা। ভেবে দেখ আমি কত অসহায়।

মোশাররফ হোসেন বললো : ভেবে দেখতে পারি। আপনি সব কথা স্বীকার করতে পারবেন ?

: অ্যাবসার্ড !

চেঁচিয়ে উঠলো সৈয়দ জামাল : আমি এখন বুড়ো হয়েছি, আমার একটা মান-সম্মানের ব্যাপার আছে। সব জেনেশুনেও কেন তুই আমাকে এরকম কষ্ট দিচ্ছিস···

: আপনি বরং এখন আসুন।

: খোকা !

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সৈয়দ জামাল।

মোশাররফ হোসেন ঘড়ি দেখলো। বললো : মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমার এক মক্কেল আসবে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়বো। সুতরাং···

সৈয়দ জামালকে অসহায় লাগছিল। চোখ-মুখ শুকনো। মাথার চুল এলোমেলো। সে উঠে দাঁড়ালো। বললো : আমি পাপ করেছিলাম, খোদা তারই সাজা দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তুইও আমাকে বুঝলি না খোকা ?

সৈয়দ জামাল টেবিল থেকে ব্যাগটা হাতে নিল। তারপর অসহায় করুণ ভঙ্গিতে বাইরে এল। আমি একটা খামের আড়ালে সরে গেলাম। দেখলাম সৈয়দ জামাল এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। হয়তো ক্লাবের কোথায়ও গাড়ি পার্ক করে এখানে এসেছিল।

আমি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, ঠিক এসময় চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল মোশাররফ হোসেন। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

বললো : আপনি ?

হাসলাম : আশা করেননি নিশ্চয়ই।

: না !

: এই-ই-হয়। ঘটনাচক্রের উপর মানুষের হাত নেই। তা যাক···সৈয়দ জামালের উপর থেকে রাগ কমলো ?

মোশাররফ হোসেন চুপ করে রইলো। বললাম : আপনার নাম বুঝি খোকা ? বাঃ, চমৎকার নাম।

এবারও মোশাররফ হোসেন কোনো কথা বললো না।

বললাম : হাসান আলীর রহস্য এবার বুঝতে পারছি হোসেন সাহেব। আপনার কথাই বলি দোষ আমার। আমারই বোঝা উচিত ছিল যে একজন ব্রীফলেস আইন ব্যবসায়ীকে চট করে বিশ্বাস করা উচিত নয় কারও।

বিষণ্ণ হাসলো মোশাররফ হোসেন। গালে হাত ঘষলো অন্যমনস্কভাবে। বললো : ভুল বুঝবেন না মাহমুদ সাহেব। সৈয়দ জামাল আমার সাথে সন্ধি করতে এসেছিল। নিজে থেকে যদি কেউ এভাবে আসে তো আমি কি করতে পারি।

: সন্ধি হলো আপনাদের ?

: না। সন্ধি হবার কোনো আশাই নেই। নিজের উপর নিজেরই কোনো আস্থা নেই সৈয়দ জামালের। খেলার পুতুল চেনেন ? দাবার বড়ে ? সৈয়দ জামাল বর্তমানে খেলার পুতুল।

: বটে ! নতুন কথা শুনছি। তা খেলোয়াড়টি কে ?

: সে প্রশ্ন আমারও ! আমিও তাকে খুঁজছি।

মোশাররফ হোসেন আমার দিকে তাকালো। আত্মবিশ্বাসে চোখ-মুখ উজ্জ্বল। কিন্তু সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম মোশাররফ হোসেনের আশ্রয় ছেড়ে শীঘ্রই অন্য কোথাও সরে যাওয়া দরকার। কে জানে হয়তো এ-ও হাসান আলীরই ভূমিকা পালন

করছে। হয়তো সৈয়দ জামালেরই চর মোশাররফ হোসেন।

ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনাটা ভেবে দেখলাম।

নেহাল বানুর সাথে আমার সম্পর্কের কথা খুব সম্ভব এখনও জানে না সৈয়দ জামাল। যখন জানবে তখন? নিশ্চয়ই উন্মত্তের মতো ছুটে আসবে আমাকে খুন করতে? আসুক। এই-ই চাই আমি। আমিই সৈয়দ জামালকে বলবো যে তার স্ত্রী নেহাল বানুকে নষ্ট করেছি আমি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, পরাজিত, ঘৃণিত শত্রুকে তারপর আমি খুন করবো নিজের হাতে।

আর ক'দিন থাকবো সৈয়দনগরে? হয়তো কালই সব শেষ হয়ে যাবে, হয়তো আজ রাত্রিই সৈয়দ জামালের জীবনের শেষ রাত।

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই ঘুম এল না। অপেক্ষা করতে লাগলাম সকালের জন্য।

নেহাল বানু কথা দিয়েছে আমাকে ডাকবে!

ষোলো

সারাদিন বাসায় থাকলাম। রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম নেহাল বানুর টেলিফোনের জন্যে। বুঝলাম আমাকে ডাকার কোনো তাগিদই নেই নেহাল বানুর।

সারাদিন অপেক্ষা করার পর রাত ন'টায় রিঙ করলাম সৈয়দ জামালের বাসার নম্বরে। কেউ একজন টেলিফোন ধরলো। মৃদু কোমল গলায় বললো : হ্যালো।

নেহাল বানু। বললাম : আমি মাহমুদ। তুমি আমাকে ডাকবে বলেছিলে ?

যেন স্তব্ধ হয়ে গেল অপর পক্ষ। তারপরই কানেক্‌শন কাট হয়ে গেল। আমাকে চিনতে পেরেই রিসিভার রেখে দিয়েছে নেহাল বানু।

কিছুক্ষণ পর আবার রিঙ করলাম। কেউ ধরলো না। টেলিফোন বেজেই চললো। বেশ কিছুক্ষণ পর খস্‌খসে আওয়াজ হলো রিসিভারে। কেউ একজন ফোন ধরলো। শান্ত, মোটা গলায় বললো : সৈয়দ জামাল বলছি···

ফোঁন ধরে রাখলাম। কথা বললাম না। ভদ্র গলায় বললো: হ্যালো।

তারপর গলার স্বর চড়লো। বললো: হ্যালো। হ্যালো।

তারপর ঝট করে টেলিফোন রেখে দিল।

আমি আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলাম। রিঙ করলাম আবার। ফোন বেজেই চললো ক্রমাগত। প্রায় দশ মিনিট পর টেলিফোন ধরলো নেহাল বানু।

'হ্যালো,'—আস্তে গলায় সে বললো।

'বানু,'—আমি বললাম: তোমার জন্যে সারাদিন অপেক্ষা করছি···

'হ্যালো'···নেহাল বানু আবার বললো। তার গলার স্বর একটু একটু কাঁপছিল। আমার সব কথার উত্তরে সে বার কয় 'হ্যালো' বললো ও কিছু ক্ষণ পর টেলিফোন নামিয়ে রাখলো।

বুঝলাম শোবার ঘরে সৈয়দ জামালের কাছাকাছি রয়েছে নেহাল বানু। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে ওর আর হয়তো এরকম হওয়ায় টেলিফোন অফিসকে প্রাণভরে গালাগালি করছে সৈয়দ জামাল। হয়তো ভাবছে রঙ নম্বরের বিভ্রাট। কালই হয়তো টেলিফোন কোম্পানিকে হুমকি দেবে এই বলে যে ভবিষ্যতে এরকম হলে তা সহ্য করা হবে না। টেলিফোন কোম্পানির লোকেরা ঘাবড়ে যাবে নিশ্চয়ই হুমকি শুনে।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রিঙ করলাম তারপর।

তিনবার। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। রাত এগারোটায় ফোন রেখে দিলাম। আপাততঃ আমার করণীয় কিছু নেই।

কাজ হলো না কিছুই। কিন্তু নেহাল বানুকে অন্ততঃ এটুকু বুঝিয়ে দেয়া গেছে যে আমার হাত থেকে সহজে ওর নিষ্কৃতি নেই।

পরদিন সকালবেলা টেলিফোন এল আমার। নেহাল বানুর মৃদু অথচ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল রিসিভারে ? মাহমুদ ?

ঃ বলছি।

ঃ কেন ওভাবে বিরক্ত করতে শুরু করেছো টেলিফোনে। তোমাকে তো বলেছি সময় হলেই ডাকবো।

ঃ কখন সময় হবে ?

ঃ সেটা নির্ভর করে অবস্থার উপর। আমি আর একজনের স্ত্রী, আশা করি সেটা তোমার জানা আছে। তোমার সাথে সম্পর্ক আছে এটা জানলে সৈয়দ জামাল আমাকে এবং তোমাকে দু'-জনকেই নির্ঘাত খুন করবে এটা ভুলে যেও না।

ঃ না, ভুলে যাইনি। এখন সৈয়দ জামাল কোথায় আছে ?

ঃ অফিসে।

ঃ বেশ, তুমি আমাকে একটা ডেট দাও।

নেহাল বানু হাসলো। বললো ঃ তোমার মতো অমন পাগল আমি দু'টি দেখিনি। মেয়েরা তোমাদের মতো পুরুষকে পছন্দ করে না মাহমুদ···

নাকি ? তাহলে উপায় ? আমাকে যে তোমার পছন্দ করতেই হবে।

ঃ দুষ্টু। পরে কথা বলবো, এখন রাখলাম, হ্যাঁ ?

বলেই আমার সাজানো কথার মাঝপথেই রিসিভার রেখে দিল নেহাল বানু। পরিষ্কার বুঝলাম আমার প্রতি এক বিন্দু ভাল ধারণা ওর নেই। শ্রদ্ধা, সহানুভূতির প্রশ্নই ওঠে না। বুঝলাম যে কোনো কারণেই হোক নেহাল বানু আমাকে সহ্য করে চলেছে। কারণটা কি ? শারীরিক তৃপ্তি ? শুধু শারীরিক তৃপ্তি, না অন্য কিছু ?

দুপুর বেলা ট্রাক নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে সৈয়দ জামালের সাথে দেখা হলো। মার্সিডিসের ভেতর গম্ভীরভাবে বসে আছে। আমার ট্রাক দেখে সে একবার বাইরে তাকালো। সোজা মসৃণ পথ ধরে তার সাদা মার্সিডিসটা চলে গেল আমাকে ছাড়িয়ে সামনে।

গ্যারেজে ফিরলাম পাঁচটায়। গ্যারেজের ডেসপ্যাচার আশু দত্তের সাথে আমার সম্পর্ক ভাল। তাকে বললাম ঃ সাহেব কি বাইরে গেলেন আশু বাবু ?

ঃ হ্যাঁ। ঢাকা গেলেন। কেন জানেন ?

ঃ না।

চোখ ঘুরিয়ে মজার ভঙ্গি করলো গোলগাল ভাল মানুষ আশু বাবু। বললো ঃ বড়লোকের দুর্ভোগ জানেন না মশাই ? উইল।

: উইল ? উইল করতে ঢাকা গেছেন ?

: উইল তো মশাই অনেক আগেই করা আছে। আবার কিছু একটা বদলাবেন হয়তো। হয়তো দেখবেন আমার আপনার নামে মশাই উইল লেখা হয়ে যাবে। হয়তো দেখবেন সাহেবের উইলে আছে : আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পর যুক্ত শ্রীবাবু আশুতোষ দত্ত পাইবে। তাহার মতো ভাল মানুষ আর এক-জনও নাই। তাহাকে আমি সব সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া গেলাম।

হো হো করে হাসলো আশু দত্ত। পান খেয়ে দাঁত কালো। বললো : না মশাই, সম্পত্তি অনেক আগেই বেগম সাহেবার নামে লেখাপড়া হয়ে আছে। ছেলেপুলে হলো না তো···সায়েব বেগম-সাহেবাকেই স্থাবর-অস্থাবর সব কিছু দিয়ে যাচ্ছেন। উইল তো মশাই হয়েছে গেল বছরের আগের বছরই। ওকি, কোথায় চললেন হন্ হন্ করে ? দাঁড়ান মশাই, একখিলি ভাল জিনিস মেরে যান···ফাসকেলাস জর্দা মশাই···দাঁড়ান···

সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরলাম। ঘরে ফিরে গোসলটা সেরে নিলাম। পেট পুরে খেলাম অনেকদিন পর। হুইস্কির একটা নতুন বোতল বার করলাম। কিন্তু পান করলাম পরিমিত মাত্রায়। অপেক্ষা করলাম রাত দশটার জন্য।

রাত দশটার বাস ধরে সৈয়দনগরে আসতে আসতে দেখলাম চারদিক এরই মধ্যে আসন্ন শরতের মিষ্টি বাতাসে ছলছল করছে। গাছপালার বিশাল ছায়ার নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে গ্রামগুলো।

সৈয়দ জামালের মোজেক করা প্রকাণ্ড দোতালা বাড়িটাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাড়ির পেছন দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা। ধাপে ধাপে উঠে গেছে কতগুলো টিলার উপর। দু'পাশে কাঁটা গাছের জঙ্গল। কোথাও খাদ। চারদিকে পাহাড়, টিলা ও ভূবন নদীর আঁকা-বাঁকা শরীর।

রাস্তা থেকে সৈয়দ জামালের বিশাল দোতালা বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়িটা অন্ধকার। বাবুর্চিখানায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ একটা নীল আলো জ্বলে উঠলো অন্ধকার দোতালায়। শোবার ঘরে।

পেছনের গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কারও চোখে পড়ার ভয় ঘাড়ে নিয়েই যাচ্ছি। দারোয়ান কথা বলে উঠলো বাবুর্চিখানার বাইরে। সরে এলাম পাতাবাহারের ঝোপে। কিছুক্ষণ পর দারোয়ান তার ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং নিচু গলায় রূপবানের গান গাইতে লাগলো। সাবধানে এগোলাম। বাড়ির ভেতর থেকে কুকুরগুলোর বীভৎস ডাক শুনলাম। একটা পেঁচা দীঘির পাড়ের তাল গাছ থেকে উড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো অনতিদূরের কামিনী গাছে।

সিঁড়িতে একটা কম পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছিল। দোতালার বারান্দা নির্জন। নিশুপ্ত। বড় তিনটে খামের ছায়া পড়েছে দেয়ালে, উপরের গেস্টরুম ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছলাম দক্ষিণের শেষ

প্রান্তে। বাঁ'দিকে ঘুরে সামান্য এগোলেই নেহাল বানুর শোবার ঘর। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। আশ্চর্য, ঘরের দরজাটা বন্ধ নয়, ভেজানো। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে।

একমুহূর্ত দ্বিধা করলাম। তারপর ভেজানো দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতেই অধীর একটি নারী দেহ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমার শরীর। হ্যাঁ, নেহাল বানু। কিন্তু আমাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। চোখের সামনে খুনী দেখলে যেমন চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ, সেরকম চেঁচিয়ে উঠলো। বললো : তুমি ?

বলার সঙ্গে সঙ্গে সর্পাহতের মতো পেছনে সরে গেল নেহাল বানু। আমি শুধু হাসলাম।

দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখলো নেহাল বানু। আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল। সহজ ও স্বচ্ছন্দ হলো। কিন্তু গলার স্বর আগের মতোই কঠোর ও বিরক্তিপূর্ণ। বললো : আমার সাথে দেখা করতে এসেছো ?

: হ্যাঁ।

: শুনেছো যে সৈয়দ জামাল আজ দুপুর বেলা ঢাকা গিয়েছে বিশেষ কাজে ?

: হ্যাঁ।

হাসলো নেহাল বানু। বললো : সুতরাং ধরে নিয়েছো যে

সৈয়দ জামালের যুবতী স্ত্রীর সাথে সারারাত প্রেমের খেলা খেলবে ?

বললাম : হ্যাঁ, তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও ভুল করেছি আমি ? ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে চমৎকার সেজে-গুজে কার জন্যে অপেক্ষা করছিলে তাহলে ? আমি ছাড়া আর কারও জন্যে ?

: হ্যাঁ। যার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম সে তুমি নও।

: বটে ? আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর নামটা কি জানতে পারি ?

: নিশ্চয়ই পারো। ভদ্রলোকের নাম সৈয়দ জামাল। আজ তাঁর ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু···কুমিল্লা পৌঁছেই সিদ্ধান্ত বদলেছেন তিনি। একটু আগে ফোনে জানিয়েছেন আজ রাতেই ফিরে আসছেন তিনি।

নেহাল বানু বিদ্রূপভরে হাসলো। বললো : সৈয়দ জামালের স্ত্রী ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে সেজে-গুজে যার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে তুমি নও মাহমুদ। দুঃখিত।

কাছে এগিয়ে গেলাম। নেহাল বানু বাধা দিল না। ওর শরীরটা নিবিড় হয়ে এল আমার আলিঙ্গনে। চুমু খেলাম আমি পাগলের মতো ওর ঠোঁটে, গালে, গলায়। অনেকদিন পর নারী দেহের নিবিড় সান্নিধ্য উন্মাদ করে তুললো আমার ক্ষুধিত শরীরকে।

আমার উন্মত্ত আদরে অপ্রতিভ হয়ে মিনতির গলায় নেহাল

বানু বললো : তুমি যাও লক্ষ্মী। দেরি করো না, প্লিজ ! সময় হলেই ডাকতাম তোমাকে। এরকম পাগলামি করলে বিপদ শুধু তোমার নয়, আমারও। মাহমুদ, প্লিজ···

আমি হাসলাম। বুঝলাম যে কারণেই হোক এখন আমাকে সহ্য করার সময় নয় নেহাল বানুর। বললাম : তোমার কথা-গুলো বিশ্বাসযোগ্য নয় বানু। তবু আমি যাচ্ছি। কবে আমাকে ডাকবে জানতে পারি ?

: না। কবে তোমাকে ডাকবো তা আমিও জানি না। আমার অসুবিধেটা বুঝতে চেষ্টা করো মাহমুদ। সৈয়দ জামালকে যত সহজ মনে হয় অত সহজ সে নয়। আমার উপর সন্দেহ তার পুরামাত্রায়। মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়ার কথা বলে হঠাৎ হঠাৎ সে কেন ফিরে আসে জানো ?

ঠোঁট কামড়ে ধরলো নেহাল বানু। বললো : ফিরে আসে আমি একা বাড়িতে কি করি এটা দেখতে। বুড়ো ভয়ানক সন্দেহ-প্রবণ। তোমাকে ডাকবার আগে আমরা নিরাপদ কিনা এটা নিশ্চিত জানা দরকার। সৈয়দ জামাল সত্যি সত্যি বাইরে কোথাও গেলেই ডাকবো তোমাকে।

আমি তবু দাঁড়িয়ে আছি দেখে অধীর হয়ে উঠলো নেহাল বানু। বললো : আর দাঁড়িয়ে থেকো না মাহমুদ। যাও এখন, প্লিজ ! যে কোনো মুহূর্তে সৈয়দ জামাল ফিরে আসতে পারে।

পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম সৈয়দ জামালের বাড়ি

থেকে। তাকিয়ে দেখলাম দোতালার নীল আলোটা নিভে গেছে ততক্ষণে। সৈয়দ জামাল কি সত্যি ফিরে আসছে রাতের বেলা ? ভাবলাম।

চ'রদিক অন্ধকার। নির্জন। হাওয়ায় ভাসছে বনেলা ঘাসের গন্ধ। বহুদূরে পাহাড়ের উপর আগুন জ্বলছে জঙ্গলে। লাল হয়ে উঠেছে পেছনের আকাশ। কাছেই কোনো একটা গাছ থেকে তক্ষক সাপের ডাক শোনা গেল। দু'টো রঙ্গিলা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালাম সৈয়দ জামালের বাড়িটা সামনে রেখে। হঠাৎ রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। গাড়িটা রাস্তার বাঁক ঘুরে এগিয়ে গেল সৈয়দ জামালের বাড়ির দিকে। হঠাৎ যেন স্পীড কমে গেল গাড়িটার। কিন্তু না, থামলো না। রাস্তা ধরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলে গেল গাড়িটা।

গাড়িটা কি সৈয়দ জামালের ? না, তা হতেই পারে না। সৈয়দ জামাল এরকম ছোট গাড়িতে কখনও চড়ে না। আর চড়লেও রাত এগারোটায় নিজের বাড়ির আশপাশে ওরকম ঘুর ঘুর করার কোনো কারণ নেই তার। গাড়িটা তাহলে কার ? এমন কোনো লোকের কি, নেহাল বানুর সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে ?

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। বহুক্ষণ। পাহাড়ের উপর জ্বলতে থাকা আগুনটা নিভে গেল। ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগলো অন্ধকারে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো রাত্রির শিশির-ভেজা

বনেলা ফুলের গন্ধ। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম সৈয়দ জামালের বাড়ির দোতালায় একটা রক্তাভ আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি, বুঝলাম সেই গাড়িটাই, পশ্চিম দিক থেকে ছুটে এল আমি যেদিকে আছি সেদিকের রাস্তায়। গাড়ির ভেতর একটি মাত্র লোক। লোকটাকে চিনতে পারলাম না। গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে গেল পুব দিকের ঢালু বেয়ে মইকুমা শহরের দিকে।

বুঝলাম সৈয়দ জামালের দোতালা বাড়ি ঘিরে এমন একটা রহস্য জমে উঠেছে যা আমার জ্ঞানের বাইরে। বুঝলাম নেহাল বানু মিথ্যে কথা বলেছে আমাকে। সৈয়দ জামাল এখানে নেই। সম্ভবতঃ ঢাকায়ই গিয়েছে। নেহাল বানু নীল আলো জ্বালিয়ে সেজে-গুজে যার জন্য অপেক্ষা করছিল সে সৈয়দ জামাল ও মাহমুদ ছাড়া আর কোনো একটা লোক।

লোকটা কে ?

ছোট্ট গাড়িতে করে যে এসেছিল সে-ই কি ? লাল আলোটা কিসের সঙ্কেত ?

ভোরবেলার একটা বাসে ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে এসে বিছানা নিলাম। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলাম দশটার। আজ আমার ডিউটি পড়েছে বিকেলে। ঘুমিয়ে পড়লাম নিশ্চিন্তে।

সতেরো

বিকেলে বেরোবার মুখে মোশাররফ হোসেনের সাথে দেখা হলো বারান্দায়। আশ্চর্য-রকম উজ্জ্বল মোশাররফের চোখ-মুখ। মোশাররফ গুন গুন করে গান গাইছিল।

অবাক হলাম বলা বাহুল্য। বিষণ্ণতার প্রতীক বলে যাকে জানি আজ হঠাৎ তার গলায় গান কেন? কিসের এত খুশি?

আমাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে একটু লজ্জিত হয় মোশাররফ। বলে: বেরোচ্ছেন?

: হ্যাঁ।

: কখন ফিরেছেন?

: রাতে।

: রাত মানে কি রাত শেষ করে ভোর সকালে?

কথাটা বলেই একটু অপ্রতিভ হয়ে যায় মোশাররফ। আমি বলি: জানেন তাহলে সবই।

: না জানার কি আছে! কাল রাতে ফেরেননি তাই বলছিলাম।

বলি : কখন ফিরেছিলাম কাল রাতে তাও জানেন যখন তখন কোথায় আমি যাই সেটাও নিশ্চয় জানেন ?

: জানি।

মোশাররফ বলে : আপনি কাল রাতে গ্যারেজে ছিলেন। অতি মাত্রায় টেনেছিলেন নিশ্চয়ই ?

বুঝলাম মোশাররফ ধরা দিতে রাজি না। ছোট্ট গাড়িটায় বসা গত রাতের সেই রহস্যময় লোকটা মোশাররফ নয় তো ? নিজেকে সামলে নিয়ে বলি : হ্যাঁ, হুইস্কির দু'টো বোতল শেষ করে তিন নম্বরে গিয়ে কাত হয়ে পড়েছিলাম। হুঁশ কাল ছিল না।

: আজও তিন নম্বরে যাবেন মনে হচ্ছে ?

হেসে বললাম : বলা কঠিন। তবে আজ হুঁশ-জ্ঞান হারাবো না। রাতের অন্ধকারে যে ছায়াটা সৈয়দনগরে ঘুরে বেড়ায় সেটাকে ধরবো।

হাসলো মোশাররফ হোসেন। বললো : সাবধান থাকবেন। ছায়ামাত্রই বিপজ্জনক। কায়াহীনদের ধরা কঠিন।

: দেখা যাক।

আমি বেরোলাম : এই লোকটা, মোশাররফ হোসেন, সত্যি দুর্বোধ্য। লোকটা হয় ভাল মানুষের চূড়ান্ত, না হয় শয়তানের ধারি। কার আশ্রয়ে বাস করছি, শত্রু না মিত্র, জানতেই হবে।

নেহাল বানু। বুকটা আমার জ্বলে উঠলো প্রবল প্রতিহিংসায়। আগে নেহাল বানুর নামের সাথে জড়াতে চাই একটা

কলঙ্ক। তারপর ধরবো সৈয়দ জামালকে। তারপর মোশাররফ হোসেনকে।

ট্রাক নিয়ে ফিরলাম রাত আটটায়। গ্যারেজে ফিরে এসে দেখি সবজান্তা আশুবাবু ব্যারাকে নিজের ঘরে বসে আপনমনে তাস সাজিয়ে পেশেন্স খেলছে।

: আশু বাবু।

: বলুন।

: সাহেব ফিরে এসেছেন?

: না, মশাই। সাহেব গা-ঢাকা দিয়েছেন ভয়ে···

চোখ বড় বড় করে আশু বাবু বললো: কিসের ভয় জানেন? বলবেন না যেন মশাই কাউকে। ইস্তিরির ভয়ে। সুযোগ পেলেই, বুঝলেন মশাই, সুযোগ পেলেই ভদ্রলোক গা-ঢাকা দেন।

: ভয় কেন আশু বাবু? শুনি তো সাহেব সাধ-আহ্লাদ করেই সুন্দরী নেহাল বানুকে বিয়ে করেছিলেন। ভালোও নাকি বাসেন খুব। দুর্নাম তো যে, ভদ্রলোক বউকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারেন না। সব সময় নাকি চোখে চোখে রাখেন।

: বাজে কথা মশাই। সম্পূর্ন বাজে কথা। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছিলেন বটে পাগল হয়ে। তার খেসারতও দিচ্ছেন এখন। বলবেন না যেন মশাই কাউকে। শুনুন, বেগম সায়েবার সাথে নাকি কার ফষ্টি-নষ্টি আছে!

: বলেন কি!

: আরে হ্যাঁ।

: অবাক করলেন আশু বাবু। তা লোকটার নাম জানেন ?

: না মশাই। ঘুঘু সাহেবের নাম জানি না। তবে জানবো একদিন না একদিন। এই শর্মার ট্যালেন্ট ছিল, বুঝলেন। কেউ বুঝলো না, এই যা। যাকগে এসব রাজা-উজির মারা। খাবেন নাকি একখিলি ফাইন জিনিস ?

: দিন।

খুশি হয়ে আশুবাবু আমাকে একটা পান দিল। বললো : ফাসকেলাস কিমাম আর জর্দা আছে মশাই। আপনাদের ওসব বোতল-টোতলের আমেজের চেয়ে কম হয় না ফুর্তি, বুঝলেন ? আচ্ছা খেয়েই দেখুন।

আশু বাবুর দেয়া পান চিবোতে চিবোতে শহরে ফিরলাম। ঘরে এলাম যখন তখন রাত ন'টা বেজে গেছে।

মোশাররফের ঘরের দরজা বন্ধ। টেবিলে একটা চিরকুট পেলাম। মোশাররফের লেখা : মাহমুদ সাহেব, যদি ফিরে আসেন তো এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। বিশেষ জরুরী কথা আছে। আমি এগারোটার আগেই ফিরবো। মোশাররফ।

কেন যেন মনে হলো একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। মোশাররফের ভূমিকাও কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছে ক্রমশঃ কিছুক্ষণ ছটফট করে ঘুরে বেড়ালাম ঘরময়। তারপর মোশাররফের

ঘরের ভেতরের দরজাটা খুলতে শুরু করলাম। দরজাটা খোলা কিছু শক্ত নয় এমন। এক পাশের দরজার বল্ট্ খুলে ফেললাম স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে। ধরা পড়ার রিস্ক আছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু মোশাররফ হোসেনের ঘর ঘেঁটে একটা কোনো সূত্র পাওয়ার তীব্র ইচ্ছার কাছে হার মানলো সব ভয়, সব আশঙ্কা।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। দেরাজ ঘেঁটে পাওয়া গেল সৈয়দ জামালের একটা চিঠি। আর কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু চিঠি-টাই যথেষ্ট। খুলে দেখলাম গতকালের তারিখ দেয়া অর্থাৎ আজই এসেছে চিঠিটা। নিজের হাতে সৈয়দ জামাল লিখেছে: খোকা, আমি এই একটু আগে ঢাকা এসে পৌঁছেছি। টেলিফোন করেছিলাম শামসুল হুদা চৌধুরীকে মিনিট দশেক আগে। তিনি রাতের বেলা দু'জন সাক্ষী নিয়ে আমার হোটেলে আসছেন। দলিলটা আজই করে ফেলবো। কাল রেজেস্ট্রি করবো কোর্টে গিয়ে। পরের দিন সৈয়দনগরে পৌঁছবো আশা রাখি। শেষ পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে পারছি এই-ই সান্ত্বনা। ভয়? হ্যাঁ, ভয়ও খানিকটা আছে বৈকি! কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে তা আর ভাবতে চাই না। যা হয় হোক। সৈয়দনগরে পৌঁছেই তোকে খবর দেবো। তুই আমার বুকভরা স্নেহাশীষ নিস। ইতি তোরই—

সৈয়দ জামাল।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলাম। কিন্তু চিন্তা করার অবসর ছিল না। আমার ঘরের টেলিফোন বেজে চলেছে ক্রিং ক্রিং শব্দে।

চিঠিটা যথা স্থানে রেখে বেরিয়ে এলাম। দরজাটার বল্ট্ লাগিয়ে দিলাম আগের মতো। টেলিফোনটা বেজে চলেছে ক্রিং ক্রিং। রিসিভার ধরতেই মিহি মেয়েলি গলায় পরিচিত স্বর ভেসে এল :

মাহমুদ ?

: বলছি।

: তুমি একটা জানোয়ার।

: কিন্তু শক্তিশালী পুরুষ জানোয়ার। আমি হাসলাম : বেগম সাহেবার মেজাজ দেখছি চড়া ? কি হুকুম ?

: সেই সন্ধ্যা থেকে কতবার ফোন করেছি জানো ?

নেহাল বানু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো : তুমি এক্ষুণি চলে এসো।

: চলে আসবো ? কোথায় ?

: সেই ঘরে।

এবার চাপা হাসি শোনা গেল নেহাল বানুর : যেখানে কাল নীল বাতি জ্বলেছিল আর আমি সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম সৈয়দ জামালের জন্যে !

: মিথ্যে কথা,

আমিও হাসলাম : তুমি অপেক্ষা করেছিলে অন্য কারও জন্যে। আর তোমার ঘরে শুধু আমন্ত্রণের নীল বাতিই জ্বলে না নিষেধের লাল বাতিও জ্বলে।

: চমৎকার চালাক ছেলে।

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, ভড়কে না গিয়ে নেহাল বানু

বললো : তোমার বুদ্ধির বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সৈয়দ জামাল ছাড়া আর কারও জন্যে যদি অপেক্ষা করেই থাকি তাতে তোমার কি ? আমার সতীত্বের পাহারাদার তো সৈয়দ জামাল। তুমি নও।

: তাহলে আমরা, মানে আমি আর আমার অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি তোমার রাতের অতিথি ? শরীরের বন্ধু ? না, নেহাল বানু···কারও সাথে কম্পিট করতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আমি আসছি।

আঠারো

বাড়িটা নিমজ্জিত ছিল অন্ধকারে। শুধু নীল বাতি জ্বলছিল দো-তালায়।

নেহাল বানুর শোবার ঘরের দরজাটা গত রাতের মতোই ভেজানো ছিল।

ভেজানো দরজা দিয়ে এক চিলতে আলো এসে লুটিয়ে পড়েছিল বাইরের মোজেক করা বারান্দায়।

দরজায় হাত পড়তেই রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে ভেতর থেকে নেহাল বানু বললো : মাহমুদ ?

: হ্যাঁ।

নেহাল বানু আস্তে হাতে দরজাটা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকতেই সেরকম সতর্কতার সাথেই বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ঘরের ভেতর স্বপ্নিল নীল আলো। উত্তর দিকের জানালা ঘেঁষে খাট। শিয়রের কাছে টিপয়। বাঁদিকে ওয়ারড্রোব ও কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর ভেনাসের নগ্ন-মূর্তি।

নেহাল বানুর পরনে লম্বা সবুজ স্ট্রাইপ তোলা হালকা

নীল সিল্কের শাড়ি। নীল জামা। কানে লম্বা ইয়ারিং দুলছে। গায়ে ড্রেসিং-গাউন চাপানো। ফিতে দিয়ে ঘাড়ের কাছে চুলগুলো বাঁধা।

আমাকে দেখে যেন রক্তিম হয়ে উঠলো নেহাল বানুর চোখ-মুখ। কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না। দূরে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি এগিয়ে গেলাম। ওর দু'কাঁধে হাত রাখলাম নরম করে। ফিসফিস করে নেহাল বানু বললো : তুমি সন্দেহ করেছিলে আমাকে ?

: হ্যাঁ।

একটু যেন আহত হলো নেহাল বানু। বা আত্ম-সম্মানে লাগলো। বললো : তাহলে এলে কেন ?

: সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে।

: সন্দেহ কাটলো ?

: এখনও না।

: তুমি একটা অসম্ভব বাজে লোক। একটা জানোয়ার।

হাসলাম। বললাম কিন্তু এই জানোয়ারটাকেই ডেকেছো তুমি, ভুলে যেও না।

নেহাল বানু হাসলো না।

বললো : কেন ডেকেছি তা তুমি জানো। ডেকেছি কারণ আমার কাছ থেকে তুমি যা চাও, আমিও ঠিক তাই চাই তোমার কাছ থেকে। সমান দাবি।

: হ্যাঁ, দু'জন দু'জনকে আমরা ঠিকই চিনেছি।

হাসলাম আমি। নেহাল বানুর শরীর কোমল হয়ে ঘনিষ্ঠতর হলো। ওর চোখে জ্বলতে লাগলো ভয়হীন, দ্বিধাহীন সেই ক্ষুধা যা আদিম ও ভয়ঙ্কর। তার ঠোঁটই প্রথম স্পর্শ করলো আমার চিবুক। চাপা অথচ হিংস্র গলায় ওকে বলতে শুনলাম: আমি তোমাকে চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম তা তুমি জানো। আমাকে সৈয়দ জামালের কথা ভুলিয়ে দাও মাহমুদ।

ক্ষিপ্র-হাতে ড্রেসিং-গাউনটা খুলে ফেললো নেহাল বানু পিছন ফিরে। তারপর শাড়ি, জামা।

ওর তৃষ্ণার পরিমাণ বাড়ছিল আমার নিস্পৃহতায়। অধীর হয়ে উঠছিল ও। নিপুণ শিল্পীর মতো ওকে উন্মত্ত করে তুলতেই চাইছিলাম আমি। চাইছিলাম আমার হাতের পুতুল করে তুলতে। নারীকে অন্ততঃ এই একটা সময় অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে হয় পুরুষের সহযোগিতার জন্যে।

বললাম: ঘৃণা করো তুমি সৈয়দ জামালকে।

: সবচে'। তুমি?

: তোমার চেয়েও বেশি।

বিছানায় টেনে নিয়ে গেলাম নেহাল বানুকে আমি। ওর উষ্ণ হাত এসে পড়লো আমার কাঁধে-বুকে। হাসতে লাগলো নেহাল বানু।

: কতখানি ঘৃণা করো সৈয়দ জামালকে তুমি মাহমুদ?

: যতখানি তুমি নিজেকে ভালবাস।

: চমৎকার চালাক ছেলে।

নেহাল বানু নিঃশ্বাস টানলো জোরে। হাসলো। ওর চোখ আবছা ভোরের আকাশ হয়ে উঠলো আলস্যে, মদিরতায়। ক্রুশের মতো দু'হাত বুকে রেখে বিছানায় শুয়ে আমাকে সে দেখতে লাগলো শঙ্খিনী সাপ যেমন নিশ্চুপ দেখে তার শিকারকে।

: বানু।

: বলো।

: সেই লোকটা কে, যে, কাল রাতে ছোট্ট গাড়িটায় করে তোমার বাড়ির চারপাশে ঘুরেছিল ?

নিঃশব্দে হাসলো নেহাল বানু। বললো : সেই লোকটা এমন কেউ যার নাম তুমি আমার কাছ থেকে বার করতে পারবে না।

: কোনো মূল্যেই না ?

: না।

নেহাল বানু আবার হাসলো। বললো : তুমি জানোয়ার ঠিকই মাহমুদ। ধূর্ত-জানোয়ার। কি বলবো তোমাকে, ধূর্ত-শেয়াল ?

: না। বিশেষণটা তোমার নিজের জন্যে তুলে রাখো বানু। আমার চরিত্র তোমার অজানা নয়। আগে আমি ছিলাম এক সুখী গৃহস্থ। বিয়ে করা বউ নিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছিলাম হানিমুন

করতে। তারপর তাসের ঘরের মতো সব ভেঙে গেল। জেল খাটলাম পাঁচ মাস। জরিমানা দিলাম সর্বস্ব বিক্রি করে। এখন একটাই নাম আছে আমার—খুনী।

উঠে বসলো নেহাল বানু। ঘৃণা ছিল না ওর চোখে। সেই আদিম ক্ষুধার ছায়া ছিল আগুনের লকলকে শিখার মতো। নেহাল বানু আমাকে দেখছিল অধীর আগ্রহে।

আস্তে আস্তে বললো: আইরিন কি খুব সুন্দরী ছিল মাহমুদ?

: হ্যাঁ।

: আমার চেয়েও?

: তোমার চেয়েও কি না জানি না। আইরিন আমার মনের মতো সুন্দরী ছিল।

: খুব ভালবাসতে ওকে?

: হ্যাঁ। কারণ সৈয়দনগরে আসার আগে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। কৈশোর থেকে আইরিনকে প্রথম দেখা পর্যন্ত আমি তৈরি হচ্ছিলাম কাউকে গভীরভাবে ভালবাসার জন্যেই। ভালবেসে ঘর বাঁধার জন্যে।

নেহাল বানু হাসলো না আমার কথা শুনে। এই প্রথম শ্রদ্ধা মিশ্রিত সহানুভূতি দেখলাম ওর চোখে। আমি অন্তরঙ্গ হলাম নেহাল বানুর।

ঘাড়ের নিচে হাত রাখতেই শিউরে উঠলো নেহাল বানু।

মদালস দৃষ্টিতে তাকালো সে আমার দিকে। ভেজা ঠোঁট দু'টি কাঁপছে।

উনিশ

বিছানা ছেড়ে প্রথম উঠলো নেহাল বানু।

পেছন থেকে একরাশ এলোমেলো চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে। বিমোহিত হলো চোখ ও মন নেহাল বানুর আশ্চর্য তন্বী, লাবণ্যময় শরীর দেখে। তাকিয়ে রইলাম অপলক অনেকক্ষণ তার দিকে।

আশ্চর্য না যে এই নেহাল বানুর জন্যেই উন্মাদ হয়ে উঠেছিল ধনপতি সৈয়দ জামাল। পুরুষের বুকে উন্মাদনা জাগাবার মতো রূপ ও যৌবন রয়েছে নেহাল বানুর।

শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিল নেহাল বানু। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলো। চুল ঠিক করলো। ঠোঁটে হালকা রঙ ঘষলো। পাউডারের পাফ বুলালো গায়ে, গলায়, ঘাড়ে। তারপর ফিরে এল আমার কাছে বিছানায়।

: মনে করো যদি সৈয়দ জামাল এ অবস্থায় আমাদের দেখতে পায় ?

প্রশ্ন করলো নেহাল বানু কিছুটা পরিহাসের ভঙ্গিতে।

বললাম : তাহলে তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাটি হবে। কিন্তু আমি খুশি হবো।

: কেন ?

: খুশি হবো কারণ সৈয়দ জামালকে তীব্রতম আঘাত দেয়ার জন্যেই আমি বেঁচে আছি। কারও মনস্কামনা পূর্ণ হলে সে খুশি হয় না ?

যেন কৌতুক বোধ করলো নেহাল বানু। বললো : তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার সাথে আমাকে এভাবে দেখলে তীব্রতম আঘাত পাবে সৈয়দ জামাল ?

: আমার বিশ্বাস তাই। তোমার কি মনে হয় ?

: স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে এক বিছানায় দেখলে সব পুরুষই আঘাত পায়। শুধু সৈয়দ জামাল কেন ?

: তা বটে। কিন্তু সৈয়দ জামালের কথা স্বতন্ত্র। তুমি তার সবচেয়ে আদরের ধন। সবচেয়ে মূল্যবান পুতুলটি। তুমি তার গর্ব আর সন্তুষ্টির পাত্রী। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে তোমাকে হারালে নিদারুণ আঘাতে মুষড়ে পড়বে সৈয়দ জামাল।

হাসলো নেহাল বানু। বললো : এবং জানতে পারলে আমাদের দু'জনকেই খুন করবে সৈয়দ জামাল। রক্ষা নেই।

নেহাল বানুর একটা হাত আশ্রয় খুঁজতে লাগলো আমার রোমশ বুকে। বললো : সৈয়দনগরে এসেছিলে তুমি সৈয়দ জামালকে খুন করতে ?

: হ্যাঁ। আজ হোক কাল হোক সৈয়দ জামালকে খুন করবোই আমি।

: খুন করে তারপর ?

: পরের কথা জানি না।

: পরের কথাটা যদি আমি যুগিয়ে দিই ?

: কথাটা ভেঙে বলো। বুঝতে পারছি না।

: খুবই সহজ কথা। বুড়ো সৈয়দ জামাল কোনো যুবতী মেয়েরই কাম্য পুরুষ হতে পারে না। সৈয়দ জামাল আমার সুখের কাঁটা। তাকে ঘৃণা করি আমি।

: হত্যা করতে চাও ?

: না, হত্যা করবে তুমি। ওকে সরিয়ে দিলে আমি তোমার।

হাসলাম। বললাম : কথাটা ওভাবে কোনোদিনই ভাবিনি। তোমার জীবনের যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি বানু। কিন্তু সৈয়দ জামালের টাকার উপর ভেসে আছো তুমি। কষ্ট হবে না সৈয়দ জামালের টাকা আর সম্পত্তি হারালে ?

: কষ্ট ? তুমি আমাকে কি ভাবো মাহমুদ, অর্থের কাঙাল ?

: নিশ্চয়ই। নতুবা তোমার মতো সুন্দরী যুবতী মেয়ের পক্ষে বুড়ো সৈয়দ জামালকে বিয়ে করার আর কোনো কারণই ছিল না।

: কথাটা তাই দাঁড়াচ্ছে বটে, নেহাল বানু স্বীকার করলো : টাকার জোরেই সৈয়দ জামাল আমাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু

টাকাই কি সব মাহমুদ ? নারীত্ব কিছু নয়।

হাসলাম। দু'হাতে বেষ্টন করে কাছে টেনে নিই নেহাল বানুকে। বলি : নারীত্ব বড় কি টাকা বড় সেটা নির্ধারণ করার কাজ তোমার বানু, আমার নয়। আমি যা জানি তা হচ্ছে তুমি সৈয়দ জামালের স্ত্রী। বিপুল টাকার মালিক তোমার স্বামী এবং সীমাহীন তোমার ভোগ ও বিলাসের আয়োজন। আজ রাত্রিবেলা বুড়ো সৈয়দ জামাল বাড়ি নেই। এই সুযোগে মাহমুদ নামে একজনকে শোবার ঘরে ডেকে এনে সেই পুরনো আরব্যোপন্যাসের কাহিনী ঘটিয়েছ তুমি। নারীত্ব হলো আপাততঃ তোমার মুখের বুলি। সত্যি হলো সৈয়দ জামালের স্ত্রী তুমি এবং···

: এবং ?

: এবং সামাজিক অর্থে এক অসতী নারী।

খিলখিল করে হেসে উঠলো নেহাল বানু। আমার বুকে মুখটা নামিয়ে বললো : চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারো কিন্তু মাহমুদ। চেহারাটাও সুন্দর। হলিউডের নায়ক টনি কার্টিসের মতো। সিনেমায় নেমে গেলেই পারতে কিন্তু ! যাক গে শোনো।

মুখ তোলে নেহাল বানু : তোমাকে চিরদিনের জন্যে চাই আমি।

: সৈয়দ জামাল ?

: তাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দাও। আমিও তোমাকে সাহায্য করবো।

: বটে ? নতুন জীবন চাও ? কিন্তু পারবে বিত্তহীন মাহমুদের ঘরে থাকতে ?

: বিত্তহীন তুমি নও মাহমুদ। আমাকে বিয়ে করলেই পাবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। টাকা আমার আছে। বুড়োকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাদ্দিনে প্রচুর টাকা জমিয়েছি।

হঠাৎ ভারি হয়ে এল নেহাল বানুর গলার স্বর। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো : আমাকে তুমি বাঁচাও মাহমুদ!

: বেশ তো চলো আমরা পালিয়ে যাই।

: সত্যি ? সত্যি বলছো তুমি মাহমুদ ?

: হ্যাঁ। শুধু পালাবার আগে···

: আমি জানি।

পিশাচীর হাসি ফুটে উঠলো নেহাল বানুর চোখে-মুখে। বললো : তুমি চুপচাপ অপেক্ষা করো মাহমুদ। সৈয়দ জামালকে খুন করার ব্যবস্থা আমিই করবো। এমন ব্যবস্থা করবো যে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

কোমল দু'হাতে কঠিন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো আমাকে নেহাল বানু। আদরে আদরে অধীর করে তুললো। রক্তে জেগে উঠলো শরীরের সাধ। কিন্তু অনুভব করলাম নেহাল বানুর ভাল-বাসার আদরে কি যেন একটা ফাঁকি আছে। যেন সব দিচ্ছে না নেহাল বানু। যেন যন্ত্রের মতো সবই করে যাচ্ছে নেহাল বানু। কিছুক্ষণের মধ্যে সব ভুলে গেলাম দু'জন। ঘরের নীল বাতিটা

ছাই হয়ে যেতে লাগলো চোখের সামনে।

যন্ত্রণা-আনন্দ মিশ্রিত হয়ে উঠলো ওর চোখ-মুখ।

কিন্তু নেহাল বানুকে চিনতে ভুল করলো না মন। ভালবাসা, প্রেম ইত্যাদি একান্তই অর্থহীন ওর কাছে। শরীরই বড় ওর কাছে। শরীর, টাকা, বিলাসবহুল জীবন ইত্যাদি। শারীরিক সুখের জন্যে হয়তো মাহমুদ নামে এক যুবককে সে নিশিরাতে তার শোবার ঘরে আহ্বান করেছে। কিন্তু সৈয়দ জামালের কাছ থেকে পালাবার মতলব আঁটছে কেন হঠাৎ। শারীরিক সুখের জন্যে তো তার প্রেমিকেরা রয়েছেই,—সম্ভবতঃ রয়েছে। সৈয়দ জামালকে তাহলে খুনের প্ল্যান আঁটছে কেন? এক রাতেই অসম্ভব প্রেম জন্মে গেল মাহমুদের প্রতি যার ফলে ঘর বাঁধার জন্যে সে লালায়িত হয়ে পড়েছে? অসম্ভব। তাহলে ব্যাপারটা কি? কি চায় নেহাল বানু?

নেহাল বানু বিছানায় শুয়েছিল চোখ বুজে। কপালে, নাকে তখনও অল্প ঘাম।

যখন বাড়ি ফিরে এলাম তখন সূর্য দেখা দিয়েছে পূর্ব আকাশে। হাঁটু পর্যন্ত জুতো, প্যান্ট সব শিশিরে ভেজা। শরীর অবসাদে ক্লান্ত। কোনো মতে ঘরে গিয়ে বিছানা নিতে পারলেই বাঁচি। তারপর ঘুমাবো। যতক্ষণ খুশি ঘুমাবো।

ঘরের বারান্দায় উঠে থমকে দাঁড়াতে হলো। কী ব্যাপার,

মোশাররফের ঘরের দরজাটা ওমন হাট করে খোলা কেন? কৌতূহল হলো।

এগিয়ে গেলাম।

ঘরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম ভয়ে বিস্ময়ে।

মোশাররফ পড়ে আছে মেঝেয়। গলাটা দু'ভাগ করা। রক্তে ভেসে গেছে ঘর। মোশাররফের চোখ দু'টি বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে যেন উল্টে।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। মোশাররফ হোসেনকে খুন করা হয়েছে! সৈয়দ জামালের চিঠির সাথে এর কিছু সম্পর্ক নেই তো? আচ্ছন্নের মতো ঘরে ঢুকলাম। চিঠিটা নেই দেরাজে। ঘরের যত্রতত্র খুঁজলাম। নেই।

বেরিয়ে এলাম মোশাররফ হোসেনের ঘর থেকে। মুহূর্তের ভেতরই স্থির হয়ে গেল সিদ্ধান্ত। পালাতে হবে এখান থেকে। সম্ভব হলে সৈয়দনগর থেকে। মোশাররফ হোসেনের খুনের পেছনে যে আছে, যে কারণেই হোক আমাকে সে জড়াতে চায় এর সঙ্গে।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। পাশ ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলাম। হাসান আলী আসছে হাসতে হাসতে দু'জন লোক সাথে নিয়ে। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। হাসতে হাসতে হাসান আলী বললো: দেখা করতেই এলাম

স্যার। দু'জন মক্কেলও নিয়ে এলাম উকিল সায়েবের জন্যে। ওভাবে পালিয়ে গিয়েছিলাম বলে রাগ করেছেন নিশ্চয়ই! হেঁ, হেঁ···মাপ চাইতে এসেছি স্যার। দু'জনই আপনারা গুরুজন আমার! কসুর কিছু হয়ে থাকলে মাপ করতে হবে। ওকি স্যার, এভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আমি হাসান আলী স্যার, হাসান আলী···কি হলো চিনতে পারছেন না?

বলেই ঘরের দিকে তাকিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠলো। ইতিমধ্যে দু'জন সঙ্গীও ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা মোশাররফ হোসেনের গলা-কাটা লাশটা দেখতে পেয়েছে। হাসান আলী ভীতভাবে শুধু একবার দেখলো আমাকে। তারপর আমি যেন পালাতে না পারি সঙ্গী দু'জনকে সেরকম একটা ইঙ্গিত দিয়েই সে ছুটলো।

বুঝলাম পুলিশে খবর দিতে গিয়েছে হাসান আলী। আরও বুঝলাম এখন পালাবার চেষ্টা করার কোনো অর্থ নেই। এই সবটা ব্যাপারই পূর্ব পরিকল্পিত। পরিকল্পিত উপায়েই আমাকে জড়ানো হয়েছে মোশাররফ হোসেনের খুনের সাথে। হাসান আলীর আকস্মিক আবির্ভাব কার্য-কারণ-সূত্রহীন কোনো ঘটনা নয়। আগের থেকেই সাজানো হয়েছিল একটা ছক, আমি এসে চমৎকার ধরা দিয়েছি সেই ছকে। মিলে গেছে ছুয়ে ছুয়ে চারের অবিকল হিসেবটা।

বিশ

তিনদিন হাজত বাস করলাম। ভেবেছিলাম একবার অন্ততঃ সৈয়দ জামাল হাজতে আসবে, এসে মোশাররফ হোসেনের খুনের সাথে এভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্যে অভ্যস্ত সরল ভঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু সৈয়দ জামাল এল না! তিনদিন আমি নিরুপদ্রবে বাস করলাম হাজতে এবং চতুর্থদিনের সকাল-বেলা যখন হাজতের পাতলা চাল-ধোয়া পানির মতো এক-পেয়ালা চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম তখন হাজতের কোলা-পসিবল গেটটা খুলে দীর্ঘকায় সুশ্রী চেহারার এক ভদ্রলোক ঢুকলো। বোরহান আহমেদ। বোরহান আহমেদকে আশা করে-ছিলাম আমি অনেক আগেই। তাই অবাক হলাম অ্যাদ্দিন না এসে তিনদিন পর তার হঠাৎ আগমনে। হিংস্রতা ও পরিহাসে অনিশ্চিত চোখ-মুখ, হাতে ব্যাটন, আমার খুব কাছকাছি এসে দাঁড়ালো বোরহান আহমেদ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপলক দেখতে লাগলো আমাকে।

বললো : কোনোদিনই তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করিনি। আমার কথার সত্যতা আশা করি এবার তুমিও স্বীকার করবে।

বললাম : হ্যাঁ, হেরে গেছি বুদ্ধিমানদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জিত কার হয় বলা কঠিন।

: কঠিন।

কথাটার উপর যেন চিন্তা করলো বোরহান আহমেদ। বললো : মোশাররফ হোসেনকে তুমি কেন খুন করেছো?

: আমি খুন করিনি।

: আদালতে তা প্রমাণিত হবে।

: হ্যাঁ, হাসান আলী আর দু'জন ভাড়াটে সাক্ষী মাননীয় বিচারকের কাছে শপথ করে বলবে যে তারা নিজের চোখে আমাকে খুন করতে দেখেছে। সেই একই ঘটনা।

হাসলাম আমি। বললাম : এবারেও কি সৈয়দ জামালের পক্ষে সাক্ষী দিতে যাচ্ছেন বোরহান সাহেব?

: সৈয়দ জামালের পক্ষে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

বোরহান আহমেদ কৌতুকের সাথে বলে : তোমার কিছু-মাত্র আইনের দৃষ্টি নেই মাহমুদ। সৈয়দ জামাল কেন লাগতে আসবে এ ব্যাপারে তোমার সাথে? মামলার বাদীপক্ষ স্বয়ং মাননীয় সরকার। সৈয়দ জামাল নয়।

: আমি জানি।

বললাম : এবং প্রশংসাই করতে হয় সৈয়দ জামালকে যে

এবারে সে এক-ঢিলেই দু'পাখি মারছে। নিজেকেও জড়াতে হলো না, এদিকে প্রাণের শত্রু মাহমুদকেও চমৎকার ফাঁসানো গেল। অপূর্ব লোকটার কলা-কৌশল। শ্রদ্ধাই হচ্ছে সৈয়দ জামালের উপর।

: মনে করা যাক সৈয়দ জামালই তোমার অদৃশ্য বাদী পক্ষ। কিন্তু ভুলে গেও না সৈয়দ জামাল আমার বন্ধু।

মৃদু হাসলো বোরহান আহমেদ। বললো : সে যাক, তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে মাহমুদ।

: নিশ্চয়ই আজই আমাকে জেলা শহরে পাঠানো হচ্ছে?

: না। ঠিক তার উল্টো। তোমার জামিনের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘন্টা খানেকের ভেতরই আদেশনামা এসে যাবে কোর্ট থেকে।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার তাকালাম বোরহান আহমেদের দিকে। ঠাট্টা করছে লোকটা? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছে সব জেনেও? এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কে এমন আছে আমার সুহৃদ, হাতেনাতে ধরা এক খুনের আসামীর জামিনের ব্যবস্থা করতে পারে যে?

বোরহান আহমেদ বললো : মিথ্যে বলবো না তোমাকে, ব্যাপারটা জেনে সৈয়দ জামাল রেগে টং হয়ে আছে। যা-তা গালাগালি করছে ম্যাজিস্ট্রেটকে। প্রচুর টাকা খরচ করতে পর্যন্ত রাজি ছিল সৈয়দ জামাল। ওর একমাত্র ইচ্ছে মোশাররফ হোসেনের খুনের দায়ে তোমার ফাঁসি হোক। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রে-

টের হুকুমের কাছে টাকাই কি আর ইচ্ছেই কি। তোমার জামিনের ব্যবস্থা হয়েছে শুনে পাগলের মতো হয়ে গেছে সৈয়দ জামাল।

: মিঃ বোরহান ?

: বলো ?

: কে আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছেন ? চেনেন ওকে ?

: নিশ্চয়ই। ওর নাম লতিফ কাজী। লতিফ কাজীকে চেনো তো ? চেনো না বললে চলবে কেন হে ? লোকটা এখানকার একজন এডভোকেট। আইনের উপর এমন দখল যে ম্যাজিস্ট্রেটরা সহজে ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। খুবই দায়িত্বশীল আর মেধাবী লোক। দোষের মধ্যে টাকার লোভ একটু বেশি।

লতিফ কাজী ? এডভোকেট ? বন্ধু খুঁজলাম মনের অলিগলি ধরে। না, এরকম কোনো লোককেই আমি চিনি না। লতিফ কাজীর নামও আমি আজই প্রথম শুনলাম।

বোরহান আহমেদ বললো : কালই কোর্টে জামিনের আদেশ দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুক্ষণের মধ্যেই আদেশনামা এসে যাবে।

একটু থেমে বললো : এই খবরটাই শুধু দিতে এসেছি বলে ভেবো না মাহমুদ। আরও একটি উদ্দেশ্য আমার আছে। হাজত থেকে বেরিয়ে কি করতে যাচ্ছো তুমি ?

: কি করতে যাচ্ছি জানতে চান ?

: হ্যাঁ।

: বিশ্বাস করেন যে আমি সত্যি কথা বলবো ?

: সে তোমার ইচ্ছে। মিথ্যে কথা বললেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বলতে এসেছি, হাজত থেকে বেরোবার পর যদি দেখি সৈয়দ জামালের পেছনে তুমি আবার লেগেছো তাহলে···

: তাহলে ?

হেসে উঠলো বোরহান আহমেদ। তারপর হাসতে হাসতেই সজোরে হাতের ব্যাটনটা দিয়ে মারলো আমার মুখের ডান দিকটায়। ব্যাটনের শক্ত চামড়াটা বসে গেল, রক্তের একটা ধারা নেমে এল চিবুক বেয়ে।

বললো : তাহলে এবার তোমার সাথে আর ভদ্রতা নয়, আইন নয়। শর্টকাট ব্যবস্থা করবো।

হাতের চেটোয় রক্তটা মুছে বললাম : সৈয়দ জামালের কুকুরগুলোর চাইতেও আপনার প্রভুভক্তি প্রবল মিঃ বোরহান।

ব্যাটনটা আবার এসে পড়লো মুখ ও নাকের উপর। বোরহান আহমেদের কিন্তু তেমন ভাবান্তর নেই। প্রায় সহজ গলায় বললো : হাজত থেকে বেরিয়ে কিছুমাত্র গোলমাল করার চেষ্টা করলে ভাল হবে না এটাই তোমাকে জানাতে এসেছিলাম। আচ্ছা চলি, শীঘ্রই দেখা হবে।

নাটকীয় ভঙ্গিতে চলে গেল বোরহান আহমেদ।

আমার জামিনের ব্যবস্থা হয়েছে বলে লোকটা ক্ষেপে গেছে সৈয়দ জামালেরই মতো। কিন্তু না ভেবে পারলাম না যে এরকম সুশ্রী চেহারার লোককে ভাল মানাতো নাটকের রঙ্গ-মঞ্চে অথবা সিনেমার পর্দায়। চাল-চলনে কথাবার্তায় কেমন একটা সিরিয়াস নাটকের উদ্ভট, বিচিত্র চরিত্র যেন বোরহান আহমেদ।

বোরহান আহমেদ নতুন করে আমাকে এক রহস্যে নিক্ষেপ করে গেল। লতিফ কাজী কে? আমার জামিনের ব্যবস্থা করার পেছনে কি উদ্দেশ্য তার? এই লোকটার ভূমিকাও অনেকটা মোশাররফ হাসেনের ভূমিকার মতো লাগছে।

একুশ

থানার হাজত থেকে যখন বেরোলাম বেলা তখন এগারো-টার কম নয়। রোদ বিছিয়ে আছে চারদিকে শিশুর মুখের পবিত্র হাসির মতো। রাস্তায় লোক চলাচল করছে জাগতিক পৃথিবীর সহজ স্বাভাবিক নিয়মে। থানার কম্পাউণ্ড পার হতেই ফর্সা, ছিপছিপে সুশ্রী এক যুবক আস্তে পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। মনে হলো এতক্ষণ যেন সে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল থানার কম্পাউণ্ডের বাইরে। কাছে এসে লোকটা বললো: দেশালাই আছে স্যার?

বলে নিপুণ ভঙ্গিতে একটুকরো কাগজ পাচার করে দিল আমার হাতে। ফিসফিস করে বললো: আশপাশে টিকটিকি থাকতে পারে, সাবধান, এখানে পড়বেন না।

লোকটা তারপর নিজেরই পকেট থেকে ম্যাচ বার করে সিগারেট ধরালো, ম্যাচটা আমার হাতে দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল। অবাক হলাম বলাবাহুল্য। কিন্তু বুঝলাম সৈয়দনগরের রহস্যময় নাটক এখন সম্পূর্ণ এক ভিন্নখাতে বইছে।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটার দিকে। জায়গাটা নির্জন। একপাশে বিশাল এক দীঘি। বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো টিনের বাড়ি।

তাকালাম। না, আশপাশে নেই কেউ। কাগজটা বার করলাম। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আছে: শাজাদ খান রোড ধরে এগোলেই স্টাফ-কোয়ার্টার রোড। স্টাফ-কোয়ার্টার রোড পার হলেই পাবেন একটা বিশাল বাড়ি। নাম শৈলনিবাস। রেসিডেন্সিয়াল হোটেল। হোটেলের ফার্স্ট ফ্লোরের শেষ মাথায় আঠারো নম্বর সিঙেল সিটেট অ্যাপার্টমেন্টটা রিজার্ভ করা আছে মাহমুদ সুলতানের নামে। হোটেলের ম্যানেজারকে লতিফ কাজীর নাম বললেই হবে। চলে যান সোজা শৈলনিবাসে। বিশ্রামের সবরকম উপকরণ রয়েছে সেখানে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্রাম নিন ও বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করুন।

চিঠির নিচে কোনো স্বাক্ষর নেই। অক্ষরগুলো গোটা গোটা। পুরুষের হাতে লেখা। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না আমার। যদি এটা সৈয়দ জামালের তৈরি আর একরকমের ফাঁদও হয়ে থাকে, তাহলেও সেখানে যেতে হবে আমাকে। স্রোতের টানে ভেসে বেড়াচ্ছে যে খড়কুটো সাধ্য কি তার জোয়ারের উজানে যায়? জড়িয়ে পড়েছি এমন এক বিচিত্র নাটকে যেখানে অদৃশ্য বিধাতার মতো রহস্যময় এক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে আমার ভূমিকা। এগিয়ে যেতেই হবে, উপায় নেই। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে

বরং ভারা যাক, যুক্তিহীনভাবেই ভাবা যাক, লতিফ কাজী নামে এক বন্ধুর আতিথ্য অপেক্ষা করছে আমার জন্য শৈলনিবাসে।

শৈলনিবাসে ম্যানেজার লতিফ কাজীর নাম বলতেই ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকালো আমার দিকে। বললো : মাহমুদ সুলতান ?

: হ্যাঁ।

: আসুন আমার সঙ্গে।

নিজে সাথে করে আমাকে ফার্স্ট ফ্লোরের আঠারো নম্বর কম্পার্টমেন্টে নিয়ে গেল ম্যানেজার। বললো : দুঃখিত যে ঘরে টেলিফোনের ব্যবস্থা নেই, নতুবা ফার্স্টক্লাস হোটেলে যা যা সুবিধে থাকে সবই পাবেন আপনি এখানে।

আমি ধন্যবাদ দিতেই একগাল হাসলো ম্যানেজার। বললো : সৈয়দ জামালের আপনি বুঝি আত্মীয় স্যার ?

প্রশ্নটা সামলে নিতে হলো। বললাম : হ্যাঁ।

: আমিও তাই অনুমান করেছিলাম স্যার। ঠিক আছে বিশ্রাম করুন স্বচ্ছন্দে এখানে। বেল টিপলেই আপনার বেয়ারা ছুটে আসবে।

ম্যানেজার চলে যাচ্ছিলো। বললাম : ম্যানেজার সাহেব।

: বলুন স্যার।

: লতিফ কাজীর বাড়িটা কি এখান থেকে অনেক দূর ?

: লতিফ কাজী !

ম্যানেজার চিন্তিত হলো : লতিফ কাজীর নামটা আমিও স্যার আজ প্রথম শুনলাম, একবার আপনার মুখে, আর এক-বার···

: আর একবার ?

: সৈয়দ জামাল যাকে পাঠিয়েছিলেন সেই ফর্সা, ছিপছিপে সুন্দর মতোন ভদ্দরলোকের কাছ থেকে।

একটু থেমে ম্যানেজার আমাকে আশ্বাস দেয় : আপনি ভাববেন না স্যার, লতিফ কাজী বলে কেউ যদি থেকে থাকে এ শহরে তাহলে সেটা বার করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না আমার পক্ষে। আপনি স্যার খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিন। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

ম্যানেজার চলে যেতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এটা তা-হলে সৈয়দ জামালেরই চক্রান্ত ? নতুন ফাঁদ ? কিন্তু তাই বা কি করে হয় ? লতিফ কাজী বলে কেউ যদি আমাকে উদ্ধার না করে থাকে, তাহলে কে সে ? সৈয়দ জামাল ? সৈয়দ জামাল কায়দা করে বার করে এনেছে আমাকে হাজত থেকে ? কিন্তু তার কি প্রয়োজন ছিল কিছু ? আমাকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে তো মোশাররফ হোসেনের খুনের সাথে আমাকে জড়িয়ে দেয়া, জড়িয়ে দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলানোই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কেন যেন মনে হলো হাজত থেকে আমাকে বার করে এনেছে সৈয়দ জামাল নয়, অন্য কেউ।

সৈয়দ জামালের ভূমিকা ছিল মোশাররফ হোসেনকে খুন করে সেই খুনের সাথে চমৎকারভাবে আমাকে জড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত। তারপর শুরু হয়েছে আর একজনের ভূমিকা। কিন্তু কে সে ?

ক্লান্ত ছিলাম। স্নান করলাম অনেকদিন পর। খেলাম পেট পুরে। ভাবলাম যা হয় হোক। যুক্তিবাদী আমি কখনও ছিলাম হয়তো। কিন্তু সৈয়দনগরে আমি এসেছিলাম সব যুক্তি বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ড আবেগ উন্মত্ত হয়ে। সুতরাং চুলোয় যাক যুক্তি, তর্ক, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। ভাবলাম ঘুমাবো সাধ মিটিয়ে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। দুশ্চিন্তা আবার অধিকার করলো আমাকে। বুকের ভেতর থেকে কে একজন যেন বললো : ঘটনার গভীরে ডুব দেও মাহমুদ। ভাবো। বাঁচার কোনো একটা পথ হয়তো পেয়ে যাবে।

গোড়া থেকে ভাবতে বসলাম। সৈয়দনগরে আমি এসেছিলাম আইরিনের খুনের প্রতিশোধ নিতে। সৈয়দ জামালকে হত্যা করতে। কিন্তু ভুল করে বসলাম সৈয়দনগরে পৌঁছেই। সৈয়দনগরে পৌঁছে আমি গিয়েছিলাম সৈয়দ জামালের সাথে দেখা করতে, দেখা করে আইরিনের হত্যার জন্য সৈয়দ জামাল অনুতপ্ত কিনা এটা জানতে। ভুলের প্রায়শ্চিত্তও আমাকে করতে হলো। সৈয়দ জামাল আর তার লেলিয়ে দেয়া পোষা কুকুর বোরহান আহমেদের নির্দেশে একদল লোকের হাতে নির্যাতিত হলাম আমি। অমানুষিক নির্যাতনের পর মৃত ভেবে ওরা আমাকে

রেখে এল গোরস্তানে। জ্ঞান ফেরার পর বহুকষ্টে ফিরে এলাম আমি শহরে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে আমি ঠাঁই নিলাম একটা হোটেলে। কিন্তু সৈয়দ জামালের প্রাণের শত্রু আমি, এটা জানতে পেরে হোটেল ম্যানেজার তার হোটেল থেকে একরকম গলাধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিল আমাকে। আমি আশ্রয় খুঁজলাম অন্য হোটেলে। কিন্তু কেউ আমাকে আশ্রয় দিতে সাহস পেল না। তীব্র হতাশায় দগ্ধ হলাম আমি। জীবন মনে হলো অর্থহীন। ভুবন নদীর উঁচু পাড় থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্ম-হত্যা করতে গিয়েছিলাম আমি আর তখন আমাকে রক্ষা করেছিল মোশাররফ হোসেন। মোশাররফ হোসেনের আশ্রয়ে থাকাকালী-নই আমার সাথে দেখা হয় এক বিচিত্র পরিবেশে নূতন করে সৈয়দ জামালের রূপসী স্ত্রী নেহাল বানুর সাথে। চিনতে পেরে-ছিলাম একমুহূর্তেই যে নেহাল বানু সুখী নয় বুড়ো সৈয়দ জামা-লের সংসারে। স্বৈরিণী নেহাল বানুর চোখে দেখেছিলাম প্রশ্রয়। বুঝেছিলাম মুখে নেহাল বানু যা-ই বলুক আমার বলিষ্ঠ পুরুষালী শরীরের আবেদন উপেক্ষা করার ক্ষমতা ওর নেই। তখনই মনে উদিত হয়েছিল এক নতুন চিন্তা। হ্যাঁ, খুন করবো সৈয়দ জামা-লকে। কিন্তু তার আগে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত করে তুলবো ওকে। নষ্ট করবো ওর যুবতী স্ত্রীকে। সৈয়দ জামাল যখন জানতে পারবে একথা [আমিই জানাবো] তখন দিগ্বি-দিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠবে সে। আর তখনই হত্যা করবো ওকে।

পরিকল্পনা যথাযথ ছিল। কিন্তু তারপরই ঘটলো কতগুলো বিচিত্র ঘটনা। যেমন হাসান আলী, মোশাররফ হোসেনের আশ্রিত হাসান আলী, আমার গোপন আশ্রয়ের সব খবরাখবর পাচার করলো সৈয়দ জামালকে এবং বোরহান আহমেদ একদিন এসে শাসিয়ে গেল আমাকে। তারপর একদিন সৈয়দ জামাল নিজেই ডাকলো আমাকে ভোরবেলা তার বাড়িতে, সন্ধির প্রস্তাব দিল, লোভ দেখালো মোটা মাইনের চাকরির। আমি বুঝলাম এভাবেই সৈয়দ জামাল আমাকে বড়শীতে গেঁথে তোলার চেষ্টা করছে। সব বুঝেও আমি চাকরি নিলাম, ওর গ্যারেজের ট্রাক চালাবার ড্রাইভারের চাকরি। চাকরিতে জয়েন করতে না করতে টের পেয়ে গেল সৈয়দ জামাল যে ওর যুবতী কামুক স্ত্রীর দিকে চোখ পড়েছে আমার। এরকম গোস্তাকী সহ্য করার পাত্র নয় সৈয়দ জামাল। শাসিয়ে দিল, দ্বিতীয়বার এরকম কিছু ঘটলে চিরতরে শেষ করে দেয়া হবে আমাকে। আদেশ হলো কোনো কারণেই তার বাড়িতে যাওয়া চলবে না আমার। কোনো কারনেই নয়। আমার রক্তে ছিল প্রতিশোধের পিপাসা। সুতরাং সৈয়দ জামালের কথা মেনে চলার কোনো কারণই ছিল না। গোপনে আমি তাই অভিযান চালালাম নেহাল বানুর শরীর পর্যন্ত পৌঁছবার। নেহাল বানু কথা দিল আমাকে ডাকবে। ঘটনা এগিয়ে যাচ্ছিলো সঠিক হিসেবেই। গোলমাল হয়ে গেল সেই দিন যেদিন মোশাররফ হোসেনের ঘরে অসহায়ভাবে বসে থাকতে

দেখলাম সৈয়দ জামালকে। বুঝলাম মোশাররফ হোসেন বর্তমানে সৈয়দ জামালের শত্রুপক্ষ বটে কিন্তু কোনো একটা গভীর সম্পর্ক ওদের ভেতর রয়েছে। মোশাররফ হোসেন লোকটা চিরকালই ছিল দুর্বোধ্য চরিত্রের। কিছুই সে আমাকে কখনও খুলে জানায়নি। একদিন শুধু বলেছিল সময় হলেই সব কথা সে জানাবে। বলেছিল সৈয়দ জামাল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ বটে কিন্তু সৈয়দ জামালও আর একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী কুচক্রীর হাতের পুতুল। অসহায় পুতুল। সেই শক্তিশালী কুচক্রী লোকটা কে ?

এর উত্তর এখনও জানিনা। কোনোদিন জানবো কিনা কে বলতে পারে ? ঘটনা স্রোত প্রবাহিত হলো তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। রহস্য-নাটকে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। গ্যারেজের ডেসপ্যাচিং ক্লার্ক আশুদত্ত একদিন কথায় কথায় জানালো সৈয়দ জামাল তার উইল সংশোধন করতে গেছে ঢাকায়। অ্যাদ্দিন উইল ছিল নেহাল বানুর নামে, হঠাৎ উইল সংশোধনের কি প্রয়োজন পড়লো সৈয়দ জামালের তা আশুদত্তেরও জ্ঞানের বাইরে। সৈয়দ জামাল ঢাকা গেছে শুনে রাতের বেলায় আমি গেলাম নেহাল বানুর কাছে নীল বাতি জ্বালিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে সেজেগুজে নেহাল বানু অপেক্ষা করছিল কারও জন্যে। আমাকে দেখে নিরাশ হলো সে। বিরক্ত হলো। জানালো এখুনি সৈয়দ জামাল আসছে। তুমি চলে যাও। সৈয়দ জামাল ফিরে আসছে ঢাকা থেকে এবং

নেহাল বানু অপেক্ষা করছে তার জন্য এই ধাপ্পাবাজি বুঝতে কষ্ট হলো না আমার। কিন্তু ধাপ্পাবাজি জেনেও নেহাল বানুর শোবার ঘর থেকে সে রাতে সরে পড়তে হয়েছিল আমাকে। সে রাতের দু'টি বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। এক, আমি চলে আসার সাথে সাথে নেহাল বানু ঘরে লাল-বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দুই, একটা ছোট্ট গাড়ি সে রাতে সৈয়দ জামালের বাড়ির চার-পাশে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুর ঘুর করেছে। কে ছিল সে রাতে সেই গাড়িতে? সৈয়দ জামাল স্বয়ং, না, মোশাররফ হোসেন? হ্যাঁ, মোশাররফকে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। তার কথাবার্তাগুলো ছিল রহস্যপূর্ণ, কিছু একটা ঘটনার পরিসমাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। আমার সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল না। মোশা-ররফ হোসেনের টেবিলের দেরাজ থেকে পাওয়া গেল সৈয়দ জামা-লের লেখা একখানা চিঠি। বোঝা গেল যথেষ্ট হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে দু'জনের। মোশাররফ তাহলে শত্রু ভাবতো কেন সৈয়দ জামালকে? সৈয়দ জামালই বা তাকে 'খোকা' বলে সম্বোধন করতো কেন? এইসব দেখেশুনে স্থির প্রতীতি হয়েছিল যে মোশা-ররফ হোসেন সন্দেহজনক চরিত্রের লোক, তার আশ্রয় থেকে যথাশীঘ্র সরে পড়া উচিত। ঠিক করেছিলাম মোশাররফের বাসা থেকে চলে যাবো। সে রাতেই ডাক পড়লো নেহাল বানুর কাছ থেকে। অবশেষে সফল হলাম সৈয়দ জামালের রূপসী স্ত্রী নেহাল বানুকে নষ্ট করতে। কিন্তু ভোরবেলা বাসায় ফিরেই দেখলাম

অভাবিত ঘটনা : মোশাররফ হোসেন গলা-কাটা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে মৃত পড়ে আছে ঘরের মেঝেয়। তার টেবিলের দেরাজে সৈয়দ জামালের চিঠিটা নেই। পালাতে চাইলাম মানে মানে। নাটকীয়ভাবে দু'জন সঙ্গীসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো হাসান আলী।

কর্তগুলো প্রশ্ন অধীর করে তুললো আমাকে।

মোশাররফ হোসেনকে কে খুন করেছে ? মোশাররফ হোসেনের খুনের দায় আমার ঘাড়ে ফেলে দেবার পেছনে কার স্বার্থ থাকতে পারে ? থানার হাজত থেকে কে আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছে এমন অযাচিতভাবে ? লতিফ কাজীই বা কে ?

হোটেলের নরম গদি আঁটা বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না। প্রশ্নগুলো অধীর করে তুললো আমাকে। তালগোল পাকিয়ে গেল সবকিছু। দরজায় টোকা পড়লো এ সময়। বাইরে ম্যানেজারের গলা শোনা গেল : স্যার কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

দরজা খুলতেই ম্যানেজার এভাবে বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইলো। বললো : লতিফ কাজীর খোঁজ চেয়েছিলেন স্যার। খোঁজ এনেছি।

ম্যানেজার নিজের কার্যকুশলতায় বেশ গর্বিত। বললো : লতিফ কাজী হলো এখানকার এক মসজিদের ইমাম। খুবই পরহেজগার লোক। বুড়ো হয়ে গেছে বেশ, তবে এখনও বাইরে চলাফেরা করতে পারে। কাজী সাহেবের বাড়িটা হলো এখান

থেকে মাইল ছয়েক দূরে।

বুঝলাম সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর খবর এটা। আসল ঘটনার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই এই নামের ভদ্রলোকটির। বাইরে চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বললাম : অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে ম্যানেজার সাহেব : খুবই উপকৃত হলাম আপনার খবরে।

ম্যানেজার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে এলাম বিছানায়। বুকটা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো হুইস্কির জন্যে। পায়চারি করলাম কিছুক্ষণ বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরময়। তারপর দরজা খুলে বেল টিপলাম। বেয়ারা এলে হুইস্কি আনতে বললাম এক বোতল। বেয়ারা কিছুক্ষণের ভেতর হুইস্কি, গ্লাস, বরফ দিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে বোতলটা হাতে নিলাম। নির্জলা কিছুটা হুইস্কি আগে ঢেলে দিলাম গলায়। বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠলো বিষাদমিশ্রিত তীব্র বিক্ষোভে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো সেই বিক্ষোভ। সোফায় বসে রইলাম নিঃশব্দে আর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে দরজার কাছে খসখসে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরজার কড়া নাড়লো কেউ। সোফা থেকে উঠে আগে বাতিটা জ্বাললাম, পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে একহাতে খুলে দিলাম দরজাটা। খোলা দরজা দিয়ে যে ভেতরে ঢুকলো অবাক হলাম তাকে দেখে।

আশ্চর্য, নেহাল বানু!

একমুহূর্ত তাকালো নেহাল বানু চারদিকে। তারপর ছুটে এসে

ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমি অভাবিত উত্তেজনায় হঠাৎ ভুলে গেলাম সবকিছু, শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। নেহাল বানুর শরীর ছিল উষ্ণ। ঠোঁট ও জিহ্বা জীবন্ত।

আমি ওকে বিছানার দিকে টেনে নিতে গেলাম। তিনদিন আগের রাতের সেই স্মৃতি বুকে আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। রক্তে শিউরে উঠলো নতুন সাধ। নেহাল বানু বুঝতে পারলো সবই। চাপা গলায় হেসে উঠলো সে। বললো : লক্ষ্মী, না। আগে কথা শোনো। জরুরী ব্যাপার অছে। সব চুকে-বুকে যাক। তারপর ওসবের সময় প্রচুর পাবো।

সুতরাং আমাকে আর একপেগ হুইস্কি ঢালতে হলো গলায়। নেহাল বানু বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর আমার একান্ত কাছে এসে বসলো।

নেহাল বানুই আমাকে জামিনে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিল। এই হোটেলে আমাকে এনে রাখার পরিকল্পনাও তার। কিন্তু লতিফ কাজী তাহলে কে ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিল না নেহাল বানু। শুধু বললো : চলো, আমরা আজই পালাই।

: পালাতে আমাকে হবেই নেহাল বানু। কিন্তু সৈয়দ জামালকে আমি শেষ করে দিয়ে তারপর যাবো।

: বলেছি তো আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

নেহাল বানু একটা হাত রাখলো আমার হাতে। বললো :

সব প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি। আমার উপর ভরসা রাখো।

হাসলো নেহাল বানু। বললো: পালিয়ে আমরা কোথায় যাবো জানো? বর্ডার পার হয়ে ইণ্ডিয়ায়। বোম্বে শহরে আমার বোন আছে ইশরাত। ওর কাছে গিয়ে উঠবো। একটা ইন্টার-ন্যাশন্যাল পাসপোর্ট যোগাড় করবো ইশরাতকে দিয়েই। ইশ-রাত ওখানকার নাম করা অভিনেত্রী। সুতরাং অসুবিধে হবে না কিছুই। তারপর আমরা ঘুরে বেড়াবো সারা দুনিয়ায়। কে আমাদের ধরবে?

হাসলো নেহাল বানু। বললো: তিনবছর ধরেই তৈরি হচ্ছিলাম আজকের এই ঘটনার জন্যে। টাকা আমি আগেই যথেষ্ট পাচার করেছি তাছাড়া লাখ পাঁচেক টাকা আমরা সাথেও নিয়ে যাচ্ছি। অসুবিধে নেই।

একটু থামলো নেহাল বানু। বললো: অসহ্য হয়ে উঠেছে জীবন। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমাকে আমার প্রয়ো-জন মাহমুদ। তোমাকে পেলে আর কিছু চাই না আমি। কি, চুপ করে রইলে যে?

বললাম: ভাবছি।

বাইশ

গাড়ি ছুটে যাচ্ছিলো কুশীগ্রামের পথ ধরে। গাড়ি চালাচ্ছে জসিম। জসিম নেহাল বানুর লোক। বিশ্বাসী। জসিমকে দিয়েই আমার জামিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল গোপনে প্রচুর নাকি টাকা দিতে হয়েছে এজন্যে। নেহাল বানুর কথাগুলো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না কিছুতেই। সবটা ব্যাপারেই কেমন যেন ধামাচাপা দেয়া। ঐ ফর্সা মতো ছিপছিপে সুন্দর চেহারার লোকটা তাহলে কে? লতিফ কাজীই বা কে? লতিফ কাজী নামে কোনো এডভোকেট যদি থেকেও থাকে তাহলেও জলজ্যান্ত একজন খুনের আসামীকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এভাবে জামিন দেয়া কি স্বাভাবিক? নেহাল বানু হেসেই উড়িয়ে দিল এসব প্রশ্ন। বললো: তুমি আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। কুশীগ্রাম ডাকবাংলোয় পৌঁছেই আমরা পেয়ে যাবো সৈয়দ জামালকে। সব ঠিকঠাক আছে।

গাড়ি ছুটে যাচ্ছিলো অন্ধকার নির্জন পথ ধরে শীতল বাতাস উড়িয়ে। পঞ্চাশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে জসিম। আমি

আর নেহাল বানু বসেছি পেছনের সিটে। জসিমের চোখ-মুখ ভাবলেশহীন। নেহাল বানু হাতের ঘড়ি দেখছে আর অস্থির হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

একসময় হাসলো নেহাল বানু। বললো ঃ কুশীগ্রাম ডাক-বাংলোয় সৈয়দ জামাল কি করছে জানো ?

ঃ কি ?

ঃ ওত পেতে বসে আছে ভ্রষ্টা স্ত্রী আর তার প্রেমিককে ধরার জন্যে।

চুপ করে রইলাম। কোনো কিছুতেই আর যায় আসে না আমার। সৈয়দ জামালকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম, হত্যার ইচ্ছে আমার তীব্র, অন্ধ। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার মন নিস্পৃহ হয়ে উঠেছে, নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছে। সৈয়দ জামালের স্ত্রীকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি অন্ধকার রাতে এটা যেমন সত্যি হতে পারে তেমনি সত্য হতে পারে সৈয়দ জামালকে আমি খুন করেছি এই ঘটনা। কোনো কিছুতেই আর যায় আসে না আমার। আমার সৈয়দনগরে থাকাও যা, ইণ্ডিয়া বা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যাওয়াও তা। একটুও পার্থক্য নেই বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার মধ্যে।

নেহাল বানু বললো ঃ আমরা পালিয়ে যাচ্ছি এ খবর সৈয়দ জামাল কখন পেয়েছে জানো ?

ঃ না।

ঃ তোমার হোটেলে গিয়ে যখন পৌঁছেছি ঠিক তক্ষুণি।

ঃ বলো কি ?

হাসলো নেহাল বানু। বললো ঃ হ্যাঁ, সৈয়দ জামাল তার বিশ্বাসী চরের কাছে খবর পেয়েছে আমরা আজ কুশীগ্রাম ডাক-বাংলোয় গিয়ে রাত্রি যাপন করবো। খবর পেয়ে তক্ষুণি লোকজন নিয়ে কুশীগ্রামের দিকে রওনা হয়ে পড়েছে সৈয়দ জামাল। এসব খবরাখবর দেয়ার ব্যবস্থা কে করেছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ? আমি।

বোধহয় অস্থির আর উত্তেজিত হয়ে তখন আমার বলা উচিত ছিল ঃ আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নেহাল বানু। ফেরো। ফিরে চলো অন্য কোনো দিকে।

কিন্তু উত্তেজনা বোধ করলাম না। শুধু নেহাল বানু যখন আদর করে আমার ঠোঁট স্পর্শ করলো তখন প্রচণ্ড এক ঘৃণা জেগে উঠলো বুকের ভেতর। কিন্তু নিশ্চুপ থাকলাম আগের মতো

নেহাল বানু বললো ঃ তুমি কি ভয় পাচ্ছো মাহমুদ ?

ঃ হ্যাঁ।

খিলখিল করে হাসলো নেহাল বানু। বললো ঃ প্রেমের সাধ কি এক্ষুণি মিটে গেল ? হায়রে পুরুষ।

বললাম ঃ কুশীগ্রাম আর কতদূরে বানু ?

ঃ আরও মাইল বিশেক। তুমি কি খারাপ বোধ করছো

মাহমুদ ?

ঃ না। ঠিক আছি আমি।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বাভাবিক ক্লান্ত আর গম্ভীর হয়ে গেল নেহাল বানু। একবার শুধু বললো ঃ তিনটের মধ্যে কুশীগ্রাম পৌঁহতে পারবে না জসিম ?

ঃ পারবো।

ঃ পারবো নয়, পারতে হবে। তা নইলে ভণ্ডুল হয়ে যাবে সবকিছু।

জসিম কথা বাড়ালো না। নেহাল বানুও চুপচাপ হয়ে গেল। এভাবে কতক্ষণ কাটলো বলা কঠিন। সিটের গদিতে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, ডুবে গিয়েছিলাম গভীর বিষণ্ণ তন্দ্রায়। হঠাৎ নেহাল বানুর হাতের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কোনো একটা জায়গায়।

ঃ এই ওঠো, এসে গেছি আমরা কুশীগ্রামে।

দূরে মিটমিট করে জ্বলতে দেখা গেল একটা আলো। কুশীগ্রাম ডাকবাংলো। বেরিয়ে এলাম আমরা দু'জনই গাড়ি থেকে। নেহাল বানু বললো ঃ আমার পিছু পিছু এসো তুমি। তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমি করবো।

হঠাৎ পেছনে নড়ে উঠলো একটা ছায়া। কিছু করার আগেই প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে পড়লো মাথায়। যন্ত্রণায় চোখ দু'টি

যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। দু'ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বহুদূর থেকে যেন মোটা গলার একটা হালকা হাসি ভেসে এল। উড়ে চলে গেল পৃথিবীর অবশিষ্ট আলো। অন্ধকার বিদ্যুৎ চিলকে উঠলো শরীরে বহুবার। তারপর কি ঘটলো জানি না।

জ্ঞান ফিরলো যখন তখন আশ্চর্যরকম ভারি লাগলো মাথাটা। বুঝলাম ঘরের মেঝেয় পড়ে আছি। প্রথমে চোখে পড়লো কতগুলো চেয়ারের পায়া, তারপর খাটের উপর একটা বিছানা। বিছানায় শুয়েছিল নেহাল বানু কাত হয়ে। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। সেই আলোয় অদ্ভুত বিষণ্ণ আর রোগা দেখাচ্ছিল নেহাল বানুকে।

ঠিক আমার মাথার উপর চেয়ারে বসেছিল কেউ একজন। আমি তার পা দেখতে পাচ্ছিলাম। বুঝলাম আমি মেঝেয় শুয়ে আছি, চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটা হয় জসিম না হয় সৈয়দ জামাল।

নেহাল বানু বললো ঃ ও কি মরে গেছে ?

ঃ গলা কেটে দু'ভাগ করে দিলেও কি মানুষ বাঁচে ?

লোকটা হাসলো মোটাগলায়। হ্যাঁ, এবারে চিনতে পারলাম, বোরহান আহমেদ। অনেক ধাঁধা সরে যেতে লাগলো চিন্তা থেকে।

বোরহান আহমেদ বললো ঃ তিনটে কাজ বাকি আছে। কিন্তু জসিম এখনও ফিরছে না কেন ?

জসিম অন্ধকার বারান্দা থেকে মেয়েলি গলায় বললো : আমি ফিরেছি।

: এদিকে আয়। বোরহান আহমেদ ডাকলো জসিমকে। উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে।

জসিম ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকলো। বোরহান আহমেদ বললো : লাশটা পরীক্ষা করে দেখ একবার।

জসিম ঘরের এক কোণে গিয়ে নিচু হয়ে কি যেন দেখলো। চমকে উঠলাম। সৈয়দ জামাল! শুয়ে আছে প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে রক্তের উপর। মোশাররফ হোসেনের মতোই গলাটা দু'ফাঁক করা।

লাশটা পরীক্ষা করে জসিম বললো : ঠিক আছে সব। সব বিলকুল ঠাণ্ডা।

: নাকি?

হাসলো বোরহান আহমেদ। এগিয়ে গেল জসিমের দিকে। হাসতে হাসতে বললো : সব বিলকুল ঠাণ্ডা? বাঃ!

জসিম কিছু একটা টের পেয়ে সরে যাচ্ছিলো, চেঁচাতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ক্ষিপ্রবেগে বোরহান আহমেদ পেছন থেকে বাঁ-হাত বাঁকিয়ে চেপে ধরলো ওর গলা, ডান হাত দিয়ে কোমর ঠেসে ধরলো। জসিমের দুর্বল শরীরটা কিছুক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ছটফট করলো, তারপর নেতিয়ে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলাম নেহাল বানুর চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে

উঠলো, হা হয়ে গেল মুখটা।

ঃ জসিমকে তুমি মারছো কেন ? ও তো আমাদেরই লোক,···

বোরহান আহমেদ অচেতন জসিমকে শুইয়ে দিল মেঝেয়। বললো ঃ এসব কাজের সাক্ষী রাখতে নেই, বুঝলে ? তাছাড়া জসিমকে এখানে রেখে যাবার আর একটা কারণ আছে। কাল খবরের কাগজে রিপোর্ট যাবে ঃ কোটিপতি সৈয়দ জামাল ও তার ড্রাইভার মাহমুদ নামে এক দাগী আসামীর হাতে খুন হয়েছে। এই মাহমুদ মাত্র তিনদিন আগে মোশাররফ হোসেন নামে জনৈক উকিলকে একই উপায়ে অর্থাৎ গলা কেটে হত্যা করেছে। কিন্তু এযাত্রা নিজেও বেঁচে যেতে পারেনি আসামী মাহমুদ। সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার জন্যে সৈয়দ জামাল গুলি ছুঁড়েছিলেন সেই গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল আসামীর তলপেটে। দু'দুটো খুন করে রক্তক্ষরণ জনিত অবসাদে আসামী তার ঘটনাস্থল থেকে পালাতে পারেনি। তারও মৃত্যু ঘটেছে।

নিঃশব্দে হাসলো বোরহান আহমেদ। পকেট থেকে একটা ধারালো ক্ষুর বার করলো। চোখ বুজলো নেহাল বানু। কিন্তু বোরহান আহমেদ স্বচ্ছন্দে ক্ষুরটা বসিয়ে দিল জসিমের গলায়। বললো ঃ হারামজাদা বোধহয় আগেই ভয় পেয়ে মরে গেছে। তবু সন্দেহের কাঁটা রাখতে নেই। যা, শালা, যা···

ক্ষুরটা অতি যত্নে মুছলো বোরহান আহমেদ। নেহাল বানুর দিকে তাকিয়ে বললো তোমার কি খুব খারাপ লাগছে রানী ?

ঃ হ্যাঁ আমাকে এই দোজখ থেকে বাইরে নিয়ে যাও, প্লিজ !

রাগে গরগর করে উঠলো বোরহান আহমেদ। বললো ঃ তোমার জন্যেই বারবার অসুবিধে হয়েছে, বুঝলে ? সেবার দিব্যি মদ খেয়ে গাড়িতে বেহেড মাতাল হয়ে পড়েছিল সৈয়দ জামাল, গাড়ি চালাচ্ছিলে তুমি···দিব্যি হারামজাদাকে শুদ্ধ ফেলে দেয়া যেত গাড়িটা খাদের মধ্যে···শালা ঐ দিনই খতম হয়ে যেত। তোমার জন্যেই···

ঃ বাঃ, তাই তো করেছিলাম।

নেহাল বানু সামান্য আহত হয় এই অভিযোগে। বলে ঃ তোমার কথা মতোই তো স্টিয়ারিঙ ঘুরিয়ে দিয়েই লাফিয়ে নেমে গিয়েছিলাম গাড়ি থেকে। কিন্তু কে জানতো ঠিক সময় বুঝেই মাহমুদের ফিয়াটটা এসে ধাক্কা মেরে থামিয়ে দেবে গাড়িটাকে রাস্তার ওপরই, বেঁচে যাবে সৈয়দ জামাল ?

ঃ কে জানতো মানে ?

প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে বোরহান। বলে ঃ তোমারই জানা উচিত ছিল সেটা। তুমিই গাড়ি চালাচ্ছিলে, দায়িত্ব ছিল তোমারই। সামনের গাড়ির হেড লাইট দেখেই···

ঃ আমার শরীর কাঁপছিল তখন ভয়ে। কিচ্ছু খেয়াল করতে পারিনি। মোড় ঘুরেই হুড়মুড় করে···

ঃ হয়েছে হয়েছে, বহুবার শুনেছি ওসব বৃত্তান্ত !

বিরক্ত হয়ে বললো বোরহান আহমেদ। রাগে গরগর করতে

লাগলো। পরিষ্কার হয়ে গেল আইরিনের হত্যা রহস্য। সে রাতে গাড়ি চালাচ্ছিল তাহলে নেহাল বানু, সৈয়দ জামাল নয়। সৈয়দ জামাল গাড়িতে পড়েছিল মদ খেয়ে, বেহেড মাতাল। নির্দোষ সৈয়দ জামাল বোধহয় ভাবতেই পারেনি যে তার যুবতী স্ত্রী আর দারোগা বোরহান আহমেদ মিলে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল সে রাতে। ঘটনাচক্রে সৈয়দ জামাল বেঁচে যায়, আমার গাড়িটা উল্টে গিয়ে মৃত্যু ঘটে আইরিনের। আমন্ত্রণের নীল বাতিটা জ্বালাতো নেহাল বানু তাহলে এই বোরহানের জন্যেই? সে রাতে ছোট্ট গাড়িটার রহস্যময় লোকটিও তাহলে সেই! কিন্তু মোশাররফকে খুন করার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল ওর?

মাথাটা আগের চেয়েও ভারি মনে হলো। বুঝলাম আমাকেও হত্যা করা হবে। আমাকে হত্যা করা হবে পিস্তল দিয়ে। যাতে আইনের চোখে প্রতীয়মান হয় যে আমি ছিলাম আক্রমণকারী আর সৈয়দ জামাল ছিল প্রতিপক্ষ। নেহাল বানুর এতদিনকার উদ্ভট আচরণের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল। সে'রাতে মোশাররফকে হত্যা করার জন্যেই আমাকে সরানো হয়েছিল দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ দূরত্বে,—যুবতী নারীর বিছানায়। কিন্তু সৈয়দ জামাল এখানে এল কি করে? কে নিয়ে এসেছে তাকে এখানে?

হঠাৎ হ্যারিকেনটা তুলে উঠলো বোরহান আহমেদের হাতে। বুঝলাম এবার আমার পালা। অপেক্ষা করতে লাগলাম মৃত্যুর

জন্যে।

বোরহান আহমেদ হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। কাছে এসে আমাকে যেন সস্নেহে দেখলো। বললো : জ্ঞান ফিরেছে তাহলে হুজুরের? বাঃ, চমৎকার! মাথাটা এখন কেমন লাগছে?

পেছন থেকে আমার মাথায় আঘাতটা তাহলে বোরহান আহমেদই দিয়েছিল? সৈয়দ জামালের খুনের দায়ে ব্যবহার করার জন্যেই এখানে নিয়ে এসেছিল আমাকে নেহাল বানু। কী চায় এরা দু'জন সৈয়দ জামালকে সরিয়ে দিয়ে? টাকা? হ্যাঁ, টাকার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। টাকা আর প্রণয়।

বোরহান আহমেদ একটা পা রাখলো আমার পেটের উপর। সামান্য চাপ দিল। বললো : লতিফ কাজী কে এবার বুঝেছো? হ্যাঁ, আমি!

হাসলো সে। বললো : তোমার সাথে কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে আলাপে আমার আপত্তি নেই। একটা চমৎকার খবর দিই তোমাকে। মোশাররফের খুনের দায়ে তোমাকে হাজতে নেয়া হয়েছিল সত্যি কিন্তু কোর্ট-ফোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, জামিন এ সবই ভুয়ো। আসলে কোনো চার্জশীটিই দেয়া হয়নি তোমার বিরুদ্ধে। কেন জানো?

: জানি, আমাকে তোমরা সৈয়দ জামালের খুনের সাথে জড়াতে চেয়েছিলে। হাজতে থাকলে কিছুতেই আমার পক্ষে

সৈয়দ জামালকে হত্যা করা সম্ভব নয়।

ঃ চমৎকার বুদ্ধিমান ছেলে। মরবার আগেই মাথা খুলে গেছে। ঠিক ধরেছো তুমি। মোশাররফের খুন সম্পর্কে থানার যে ডায়রি আছে তাতে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে সন্দেহ করে হাজতে রাখার কথা আছে। কিন্তু লোকটা যে তুমি তা কখনও বলা হয়নি।

ঃ তোমার দূরদৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয় বোরহান আহমেদ। কি বললে খুশি হবে, কৃতজ্ঞ, বাধিত ? কোনটা ?

হাসলো বোরহান আহমেদ। বললো ঃ মরার আগেও তেজটা ঠিক আছে !

ঃ তা আছে। মরার আগে দু'একটা প্রশ্নের উত্তর জানতেও ইচ্ছে করছে।

ঃ মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও কৌতূহল ? বাঃ, চমৎকার মেধাবী ছেলে !

বোরহান আহমেদ পকেট থেকে চকচকে পিস্তলটা বার করলো। আমার দিকে তাক করলো একবার। নীরবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বোরহান আহমেদ ট্রিগার টিপলো না। বললো ঃ আমার আপত্তি নেই। তোমার প্রশ্নগুলো কি ?

ঃ সহজ ও সরল প্রশ্ন। তোমার মতো পশু কতখানি নিচে নামতে পেরেছিল জানতে চাইছি। মোশাররফকে কেন খুন করেছিলে তুমি ?

ঃ খুবই ন্যায়সঙ্গত কারণে। মোশাররফ ছিল,—চমকে

যেও না, মোশাররফ ছিল সৈয়দ জামালের জারজ সন্তান, এক-মাত্র অবৈধ উত্তরাধিকারী। বিবেকের পীড়ন শেষের দিকে অধীর করে তুলেছিল সৈয়দ জামালকে। সে উইলে মোশাররফ হোসে-নকে তার সন্তান বলে স্বীকার করে সম্পত্তির অর্ধেক লেখাপড়া করে দিয়েছিল।

: সুতরাং পথের কাঁটা দূর করে দিয়েছো ?

: হ্যাঁ, এখন সৈয়দ জামাল এবং মোশাররফ হোসেনের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবার কথা নেহাল বানুর।

: চমৎকার পরিকল্পনা সন্দেহ নেই।

বললাম : আচ্ছা বলতে পারো সৈয়দ জামাল হলফ করে কেন কোর্টে মাননীয় বিচারককে বলেছিল গাড়ি সেই চালাচ্ছিল, তার স্ত্রী নেহাল বানু নয় ?

: সহজ কারণ। স্ত্রীকে দুর্নাম আর বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

: সৈয়দ জামাল এই কুশীগ্রাম ডাকবাংলোয়ও কি এসেছিল স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে ?

হো হো করে হাসলো বোরহান আহমেদ। বললো : এটা মোটেই কুশীগ্রাম ডাকবাংলো নয়। এটা হলো রাস্তা থেকে বহু-দূরে একটা ভূতের বাড়ি। আশপাশে দু'দশ মাইলের ভেতর কোনো জনবসতি নেই। আর সৈয়দ জামাল কোনোদিনই স্বেচ্ছায় এই বাড়িতে আসতে রাজি হতো না। সৈয়দ জামালকে তার

ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আসতে হয়েছে। কী, বোধগম্য হচ্ছে না বিষয়টা ? একান্তই ভেঙে বলতে হবে ? শোনো তাহলে। সৈয়দ জামালকে হত্যা করা হয়েছিল তার বাড়িতেই, সন্ধ্যার ঠিক পরে। হ্যাঁ, আমিই করেছিলাম। গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম। কাক-পক্ষীতে টের পায়নি। হা হা! যাক গে, এসব বাজে ব্যাপার। এখন দয়া করে উঠে দাঁড়াও, হ্যাঁ হাত দু'টো উপরে তুলতেই হবে, নতুবা বলা যায় না বাবা···

বুঝলাম বোরহান আহমেদকে খুনের নেশা আচ্ছন্ন করে তুলেছে। দাঁড়ানো অবস্থায় ঠিক হার্ট-পয়েন্ট গুলি করতে চায় বোরহান আহমেদ যাতে এক গুলিতেই সন্দেহের কাঁটা দূর হয়। সময় ঘনিয়ে এসেছে আমার। দু'হাত উপরে তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বোরহান আহমেদের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো পিশাচের হাসি। বললো : তোমাদের দু'জনকেই আর একটা খবর দিই। এই নাটকের সবচে' মজার খবর!

নেহাল বানুর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো বিস্ময়। হাসতে হাসতে বোরহান বললো : হ্যাঁ, নেহাল বানু, আমার পিস্তল তোমার জন্যেও তৈরি!

গলা চিরে একটা অসহায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল নেহাল বানুর : বোরহান!

: আমি খুবই দুঃখিত যে তোমাকেও আমার পিস্তলের শিকার করতে হলো।

বোরহান আহমেদ বললো : সৈয়দ জামালকে খুন করার আগের মুহূর্তেও জানতাম না আমাকে এই ভূমিকা নিতে হবে। আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। নিজের নিরাপত্তার জন্যেই এখন খুন করতে হবে তোমাকে। উপায় নেই।

বোরহান আহমেদ পিস্তলটা তাক করে ধরে আমার ও নেহাল বানুর ঠিক মাঝামাঝি, দু'জনকেই কভার করে। বলে : তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল টাকার জন্যে। ভালবাসা ? না, নেহাল বানু, ভালবাসার কাঙাল আমি নই। আমার প্রয়োজন ছিল টাকার। এবং এজন্যেই আমি এসেছিলাম সৈয়দনগরে আমার ভাই সচ্চরিত্র দারোগা বোরহান আহমেদের কাছে।

বিমূঢ় হই নেহাল বানুর মতো আমিও। দারোগা বোরহান আহমেদের ভাই ! সুমুখে দাঁড়ানো এই লোকটা তাহলে কে ?

: হ্যাঁ, বোরহান আহমেদ আমার ভাই, যমজ ভাই। বোরহান আহমেদকে আমি খুন করেছিলাম আজ থেকে তিন বছর আগে ওর বাড়িতে। আমি ছিলাম বোম্বের দাগী আসামী। খুন করা ছিল আমার নেশা। কিন্তু অভিনয়েও আমি কম যাই না, কি বলো ? সৈয়দনগরে আমি দীর্ঘ তিন বছর সকলকে ফাঁকি দিয়েছি। বোরহান আহমেদের ভাই আমি কামরান, কামরান আহমেদ। বোরহান আহমেদকে খুন করে ওর লাশটা আমি ওরই ঘরের মেঝেয় পুঁতে রেখেছি, পাকা মেঝের নিচে ভাই সাহেবের লাশটা নিশ্চয়ই এখন মাটিতে মিশে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ···

আমি বললাম : সকলকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি কামরান। সৈয়দ জামাল তোমার পরিচয় জানতো, আর···

: আর মোশাররফ হোসেন। You are right মাহমুদ। এই দু'জনকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সৈয়দ জামাল আগাগোড়া আমাকে জানতো। কিন্তু ভয় দেখিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে রেখেছিলাম। ভীষণ ভীতু ছিল সৈয়দ জামাল। জানতো একটু এদিক-ওদিক হলেই দাগী খুনী কামরানের হাতে ওর নিস্তার নেই।

নেহাল বানুর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো উত্তেজনায়। বললো : কিন্তু আমাকে তুমি কেন মারবে কামরান? তুমি যেই হও, আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। সৈয়দ জামালের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অংশীদার আমি। টাকা চেয়েছিলে না তুমি? আমাকে বিয়ে করলেই প্রচুর টাকা পাবে তুমি।

: আমারও তাই ধারণা ছিল বানু।

কামরান তিক্ত গলায় বললো : কিন্তু সৈয়দ জামাল সব ভণ্ডুল করে রেখে গেছে। ওকে খুন করার পর ওর এ্যাটাচী কেস ঘেঁটে যে উইলের কপি পাওয়া গেছে সেটাই তোমার জীবনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, বানু, সেই উইলটা সৈয়দ জামালের শেষ উইল। আর শেষ উইলে সৈয়দ জামাল তার অর্ধেক সম্পত্তি মোশাররফ হোসেনকে, বাকি অর্ধেক সম্পত্তি গরীব-দুঃখীদের···

তিক্ত হাসে কামরান : গরীব-দুঃখীদের দান করে গেছে। তোমার ভাগে শূন্য।

হা হা করে হাসলো কামরান। বললো : তোমাকে খুন করতে হবে এ আমি জানতাম না বানু, সৈয়দ জামালকে খুন করার মুহূর্তেও জানতাম না! এখন আমি নাচার। বলেছিলাম না আরও তিনটে কাজ বাকি আছে আমার? এক জসিম, দুই মাহমুদ আর তিন নম্বর তুমি···

ঘটনার অভাবিত পরিণতি হকচকিয়ে দেয় আমাদের দু'জনকে। কামরান বললো : দু'নম্বর কাজটা শেষ করতে দাও বানু, নেক্স্ট্ হচ্ছো তুমি। কথা দিচ্ছি এমনভাবে মারবো যাতে ভব-যন্ত্রণা মুহূর্তেই মিটে যায়।

হঠাৎ নেহাল বানু টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা পানি-ভর্তি জগ চোখের পলকে ছুঁড়ে মারলো কামরানের দিকে। পরমুহূর্তেই গুলির আওয়াজ ও নেহাল বানুর মরণ চিৎকার। কিন্তু চিৎকারে কান দেবার সময় ছিল না হাতে। একটি মাত্র সুযোগই ছিল আমার হাতে এবং সেটি ব্যবহার করলাম। সম্পূর্ণ একটি মুহূর্তের মনোযোগ দিতে হলো কামরানকে নেহাল বানুর প্রতি। সেই মুহূর্তটির সদ্ব্যবহার করলাম আমি। একটা চেয়ার তুলে শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি একত্রিত করে মারলাম কামরানকে···পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল ওর হাত থেকে। পেছনে সরে যাচ্ছিলো কামরান, প্রাণপণে বুটশুদ্ধ পায়ের একটা লাথি বসালাম ওর তলপেটে। পেট চেপে বসে পড়লো কামরান। আর একটা চেয়ার তুলে ওর মাথায় মারলাম। চেয়ারটা ভেঙে

চৌচির হয়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো কামরান। আবার লাথি মারলাম ওর মুখে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। শরীরে জেগে উঠলো অসুরের শক্তি। কিছুক্ষণের ভেতরই কামরান নেতিয়ে পড়লো। গোঙানির আওয়াজটাও বন্ধ হয়ে গেল আরও দু'মিনিট যেতেই।

উঠে দাঁড়ালাম। কামরানের বাঁ'চোখটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে বুটের গোড়ালির ঘায়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। ঘাড়টা ভেঙে গেছে। ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর।

এতক্ষণে চোখ পড়লো নেহাল বানুর দিকে। হ্যাঁ, সেও মৃত। গুলিটা গিয়ে বিঁধেছে হার্ট-পয়েন্টে।

কিছুক্ষণ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম চার চারটে মৃতদেহ পড়ে থাকা ঘরটায়। তারপরই কেটে গেল আচ্ছন্নের ভাবটা।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বাইরের বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিলাম। হাল্কা হয়ে গেল মনটা।

আইরিন, তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি।

আমি এখন মুক্ত।

—শেষ—

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন।

কিন্তু অনেক ঘুরে, অনেক খুঁজে, পুস্তক বিক্রেতাকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও অনেক পাঠক সেবা'র কোনো কোনো বই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমাদের কাছে চিঠি আসে।

তাঁদের জন্যে আমরা ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি। ইচ্ছে করলেই আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। নতুবা নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

পাতকী

লেখক : কাজি মাহবুব হোসেন

মূল্য : স্থির হয়নি।

বিষয় : ওয়েস্টার্ন সিরিজের দ্বিতীয় বই।

নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ জাভেদ, কারও সাতে-পাঁচে নেই। লোকালয় থেকে দূরে দুর্গম এক উঁচু এলাকায় র‍্যাঞ্চ (পশু খামার) করেছে। হঠাৎ টেক্সাস থেকে বিশ-পঁচিশ জনের একটা সশস্ত্র দল এসে তাকে ভিটেছাড়া করতে চায়। ···রুখে দাঁড়ালো জাভেদ।

roni060007

কলঙ্কিনী

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস

সাগর চৌধুরী

ভয়ঙ্কর এক প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার বুকের ভেতর। রক্ত চাই, রক্ত চাই! সৈয়দ জামালকে কি খুন করবো আমি? না। খুন করলে বেঁচে যাবে ও। তার আগে নিষ্ঠুর মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে দগ্ধাতে হবে ওকে। তারপর খুন করবো। সৈয়দ জামালের সুন্দরী স্ত্রীর প্রেমিক হতে হবে আমাকে। প্রতিশোধ। প্রতিশোধ আমি নেবই।

বার টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১